রবিবারের বৈঠক

যুগশঙ্খ
SUPPLI
রবিবার, ২০ মে ২০১৮

সাহিত্যের সঙ্গে আরও কিছু...

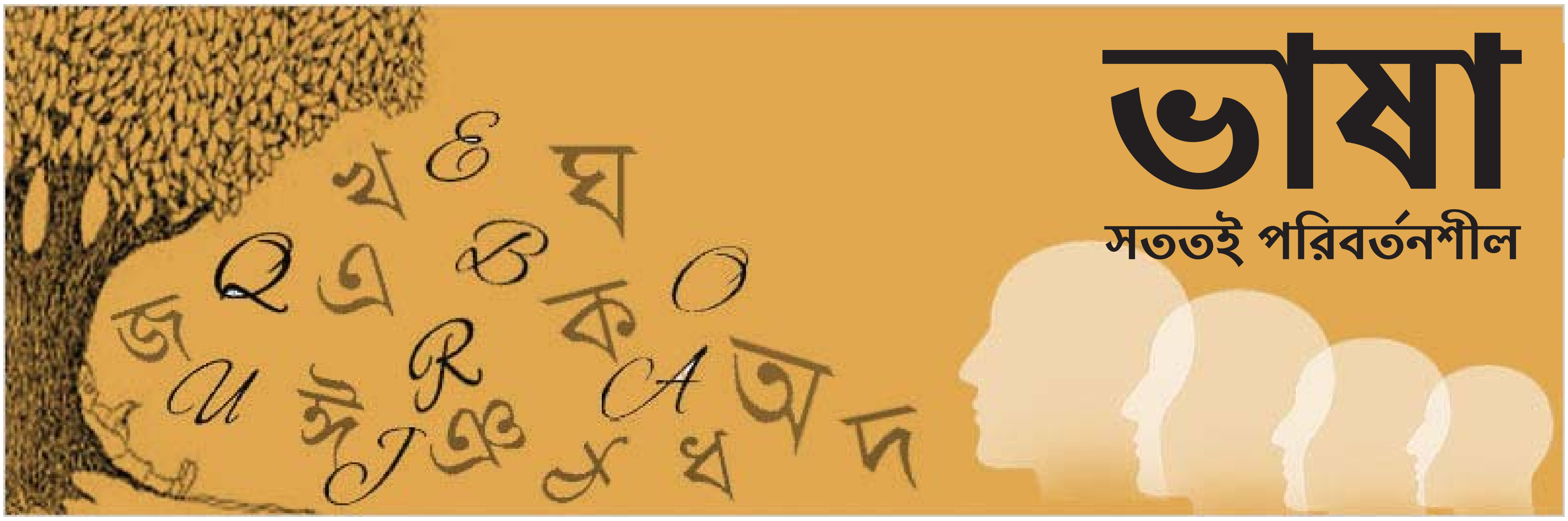

ভাষা

সততই পরিবর্তনশীল

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

‘দ্যাখ, ব্রেকআপ হয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। ও নিজের স্বার্থে তোকে ইউজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাইট নাউ এটা কোনও প্রবলেম নয়। কমপিটিবিলিটি বলে একটা ব্যাপার আছে। আর রিলেশনশিপ আবার ঠিক গড়ে উঠবে।’- এটি ছিল এক বন্ধুর সান্ত্বনা আর এক বন্ধুকে।

এভাবেই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ভাষা আর তার ব্যবহার। সবার অলক্ষ্যে, চুপিচুপি। প্রেম, বিচ্ছেদের মতো চিরন্তন শব্দগুলি জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে অন্য শব্দকে। বদলে যাচ্ছে ভাষার গঠন, বাচনভঙ্গি। এমন কী গলার স্বরও। বদলাবেই না বা কেন? কেউ মনে রাখুক আর না রাখুক, ভাষা পরিবর্তনশীল। কালের নিয়মে অনিবার্য তার উচ্চারণের পরিবর্তনও। ভাষার অস্তিত্বই তো নির্ভর করে তার নমনীয়তার উপর, সহনশীলতার উপর। যে ভাষা অন্য কিছু গ্রহণ করেনি, নমনীয়তা দেখায়নি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করার উদারতা দেখায়নি, সে ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে।

সংস্কৃত বা ল্যাটিনে কেউ আর লেখে না, বলে না। মানিয়ে নেওয়াতেও তো সমৃদ্ধ হয় ভাষা। গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে নিতে পারে সকলের কাছে। পরিবর্তন মেনে না নিলে তো এখনও মাগধী প্রাকৃত ভাষাতেই যোগাযোগ রক্ষা করতে হতো বাঙালিকে। সেই ভাষার অপভ্রংশ ভাষা হিসাবেই দশম শতাব্দীর শুরুতে বাংলা-সহ আরও কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বলে ধরা হয়। এটা সবারই জানা যে ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বাংলা ভাষা শুরু থেকেই নিঃশব্দে আত্মস্থ করেছে অজস্র বিদেশী শব্দ। তাকে আপন করে নিয়েছে, ব্যবহার করেছে নিজের মতো করে। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও একইভাবে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা আজকের আধুনিক বাংলার রূপ নিয়েছে। এই বিবর্তন তো একদিনে হয়নি। প্রথমপদ রচনা বা প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন ‘চর্যাপদ’-এর ভাষা যেমন ছিল, মধ্যযুগে এসে তা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করেছে। আরও সহজ, আরও কাছের, আরও বোধগম্য। মানুষ সহজে বুঝতে পেরেছেন সে ভাষার অর্থ, সমৃদ্ধ করে নিতে পেরেছেন নিজেদের জ্ঞান আর অনুভূতিকে। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ইত্যাদি তার নিদর্শন। পালটে গেছে লিখিত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুখের ভাষাও। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই যে আধুনিক যুগকে ধরা হয় তার সাহিত্যরূপ আরও ভিন্ন। ক্রমশ পরিবর্তন হতে হতে তা আজকের ভাষার রূপ নিয়েছে।

প্রশ্ন সেখানে নয়। প্রশ্নটা মাঝে মাঝেই এসে যায় অন্যদিক থেকে। বাংলাভাষা কি শুদ্ধতা হারাচ্ছে? বিকৃত বা কৃত্রিম উচ্চারণ, অন্য শব্দে রূপান্তর, অনর্থক ইংরেজি আর হিন্দি ভাষার মিশেল দিয়ে ব্যবহার, এসব কি বাংলা ভাষার সর্বনাশ করে দিচ্ছে? বিশুদ্ধতার পক্ষে যাঁরা সওয়াল করেন তাঁরা হয়তো অনেকেই সেরকম মনে করেন। তাঁদের মতে অনর্থক বেশি বেশি বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষাকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। এখন অনেকে চুপ হওয়ার বদলে মিউট হয়ে যান। গৃহবধূরা তো হোমমেকার হয়ে গেছেন। তাঁরা জামাকাপড় কিনতে না গিয়ে শপিং-এ যান। এখন ছাত্রছাত্রীরা কোনও বিষয়ে হাইয়েস্ট নাম্বার পায় না, হাইয়েস্ট নাম্বার আনে। প্রেমিক-প্রেমিকা বা লাভার শব্দগুলির বদলে জায়গা করে নিয়েছে বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড শব্দগুলি। প্রিয় সম্বোধনের জায়গায় বলা হয় হাই ডিয়ার। বাঙালি রবিবারে আর মাংস খায় না। চিকেন বা মটন খায়। মুহূর্তটিকে বোঝানোর জন্য বলে রাইট নাউ। কিন্তু ভাষাকে উন্মুক্ত করার পক্ষে যাঁরা, তাঁদের যুক্তি তৎসম শব্দের ছোঁয়া বাঁচাতে বাঁচাতে বাংলাভাষাকে তো আরবি-ফার্সি-ইংরেজি-উর্দু-সহ অজস্র বিদেশী শব্দ আত্মসাৎ করেছে। এ তো নতুন কিছু নয়। পৃথিবীর সব ভাষাই তো তাই করেছে। তাছাড়া তাত্ত্বিক দিক থেকে যদি মেনেও নেওয়া যায়, কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে! আসলে ভাষাকে ব্যবহার করে অন্যজনকে তো মনের ভাব পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে। সরাসরি যোগাযোগের জন্য তো ভাষাই একমাত্র মাধ্যম। সেক্ষেত্রে তার বোঝার মতো করে যতটা সম্ভব তাকে সহজ সরল হতেই হবে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বিভিন্ন বিদেশী ভাষা থেকে উদারভাবে শব্দগ্রহণের পক্ষে ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘বাঙ্গালা ভাষা’ তে তিনি বলেছেন, ‘বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে- যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে- তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।’

বাংলাভাষা ঠিক সেই ধারাটিই অনুসরণ করেছে। সময় যে পরিক্রমার মধ্য দিয়ে যায়, সংস্কৃতি যে ধারায় বয়ে চলে সেখানে অবধারিতভাবে অপেক্ষা করে পরিবর্তন। আর সবকিছুর মতো তার ছাপ পড়ে ভাষার ওপরও। ভাষা তো অচল নয়, এর ভিতরের শক্তিই তাকে সচল রাখে। তাই ভাষাকে তুলনা করা হয় নদীর স্রোতের সঙ্গে। নদী মানেই আপন খেয়ালে বয়ে যাওয়া। নদী মানেই তার সঙ্গে এসে মিশবে কিছু উপনদী। তার থেকে সৃষ্টিও হয়ে যাবে কিছু শাখানদী। এটা ঘটতে থাকবে প্রকৃতির নিয়মেই। তার গতি রুদ্ধ করার শক্তি কারও নেই। আর সেই চলায় নদীর স্রোতের মতোই কোথাও তা ভাঙবে, কোথাও গড়বে। কিছু ভাষা থেকে এসে ঢুকবে নতুন নতুন অচেনা শব্দের স্রোত, এসে মিশবে সেই ভাষার স্টাইল। আবার কখনও তৈরি হয়ে যাবে নতুন কোনও উপভাষা, স্থানভেদে কালভেদে কিছু অন্য উচ্চারণে। তৈরি হয়ে যাবে নতুন বাক্যবিন্যাস, নতুন অভিব্যক্তি। জীবনের সঙ্গেই যেহেতু ভাষা সম্পৃক্ত, তাই জীবনের প্রয়োজনেই জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে অনবরত ধারণ করবে নতুন নতুন রূপ। খুব কম সময়ের ব্যবধানে দেখলে এই পরিবর্তন ততটা বোঝা না গেলেও অনেক দূরে তাকালে স্পষ্ট ধরা পড়ে।

এই প্রসঙ্গে অবধারিতভাবে এসে যান রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর ‘বাংলাভাষা পরিচয়’-তে বলেছেন, ‘দশম শতকের বাংলাকে বিংশ শতকের বাঙালি আপন ভাষা বলে চিনতে

Language
Linguaggio
ЯЗЫК
Γλώσσα
Język
بولی
لسان
השפה
Lenguaje
Langage
ভাষা
言語
भाषा
Ngôn ngữ
اللغة
Linguagem
Wika
언어
Sprache
语言
Bahasa

অন্য পাতায়: প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, স্পেশাল কলাম, আত্মজীবনী, ধারাবাহিক উপন্যাস, গ্রন্থ সমালোচনা, রাশিফল

পারবে কি না সন্দেহ। শতকে শতকে ভাষা ক্রমশ ফুটে উঠেছে, আধুনিককালেও চলছে তার পরিণতি। নতুন নতুন জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, রীতির সঙ্গে, আমাদের পরিচয় যত বেড়ে চলেছে, আমাদের ভাষার প্রকাশ ততই হচ্ছে ব্যাপক।'

তাই সেই অর্থে ব্যাপক প্রকাশ অসঙ্গতিপূর্ণ বলা যাবে না। পরিবর্তন চোখে পড়বে ব্যাপকভাবেই। যেখানে যে শব্দ ব্যবহার করলে কথাটির ওজন বাড়ে, অর্থটি স্পষ্ট হয়, সেখানে সেটিই বসানো উচিত। রবীন্দ্রনাথ 'রোম্যান্টিক' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ মানতে চাননি। তেমনি সেই প্রায় চল্লিশ বছর আগে 'কোণি' সিনেমায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই ডায়লগ, 'ফাইট, ফাইট, কোণি ফাইট' ভোলা যায় না। 'ফাইট' শব্দটি যে জোর আর আবেগ নিয়ে আসে তেমনটি হয়তো বাংলা প্রতিশব্দে আসতো না। তাছাড়া গোটা বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা হল ইংরেজি। তাই তাকে এড়িয়ে থাকা যাবে না। আর হিন্দি সিনেমা, সিরিয়ালের ব্যাপক প্রচার প্রসারের ফলে সাধারণ মানুষের মনে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। এতে বাংলা ভাষার সম্পদ বাড়বে বৈ কমবে না। তা যত সহজ আর আটপৌরে হবে ততই তার শ্রীবৃদ্ধি হবে।

কথ্য ভাষায় শুদ্ধ বাংলার ব্যবহার কতটা বিব্রতকর হতে পারে তার একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। সময়টাও প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের। বাসের কন্ডাক্টর টিকিট কাটতে কাটতে এক যাত্রীর কাছে ভাড়া চাইলেন। টাকা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় নামবেন তিনি। উত্তরে ভদ্রলোক জানালেন, 'সার কারখানার বসতি।' কন্ডাক্টর কিছু বুঝতে না পেরে এর ওর দিকে চাওয়া চাওয়ি করলেন, কেউ যদি কিছু বলতে পারেন কোন স্টপেজটা তিনি বোঝাতে চাইছেন। একজন বুঝিয়ে দিলেন, 'ফার্টিলাইজার কলোনি।' হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন কন্ডাক্টর। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য নিশ্চয়ই নিস্প্রয়োজন।

চরম প্রতিযোগিতার যুগে মানুষের কাছে সময়ের দাম খুব বেশি। তাই অনেক কিছুই শর্টকাটে করতে হয়। সেটা একটা ট্রেন্ড। তার প্রভাব এসে পড়ে ভাষাতেও। যেমন লেখার ক্ষেত্রে, তেমনি বলার সময়ও। তাই ভাই হয়ে যাচ্ছে 'ব্রো'। 'বিন্দাস' শব্দটি উচ্চারণ করে দিলেই হাসিখুশি বা ভালো থাকার অবস্থাটি সহজে প্রকাশ করা যায়। আবার প্রশ্ন উঠে আসে, মানুষ বুঝতে পারছে কিনা; যে বলছে এবং যাকে বলছে তারা ভাষার অন্তর্নিহিত ভাবটির সঙ্গে নিজেরা রিলেট করতে পারছে কিনা। ভাষা তো মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য। এই প্রজন্ম নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, বোঝাতে পারছে, না হলে সবার মুখে মুখে এত সহজ প্রচলন হয় কী করে। একসময়ের বয়স্ক বা বৃদ্ধ ব্যক্তিরা সসম্মানে সিনিয়র সিটিজেন হয়ে ওঠেন। এই সহজ ব্যাপারটাই আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে নেয় সাধারণ মানুষকে। যা সহজ সরল নয় তাকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়াই জনজীবনের প্রবণতা।

ভাষার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে বিজ্ঞাপনের ভাষাও। বিশ বছর আগেও কোনও সুগন্ধি তেলের বিজ্ঞাপনে বলা হতো 'সুস্থ চুল, সুন্দর চুল', এখন সেখানে বলা হয় 'ঠান্ডা ঠান্ডা, কুল কুল।' কিংবা 'চুলের চাই রাইট কেয়ার।'

তবে একটা ব্যাপারে খেয়াল রাখা খুব দরকার সেটা হল অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হতেই পারে, যদি বাক্য গঠনের প্রয়োজনে তার দরকার হয়। কিন্তু তা যদি আরোপিত হয় তবে তা খুব ক্ষতিকর এবং সেই অদ্ভুত ভাষার প্রবাহমানতা থাকবে না।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার পরিবর্তন হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই পরিবর্তন মানে ভাষার হারিয়ে যাওয়া নয়। তাই যতই অভিযোগ করা হোক না কেন এফএম রেডিওর আর জে-দের কল্যাণে বাংলাভাষা বিকৃত হচ্ছে, জগাখিচুড়ি রূপ ধারণ করছে, ক্রমশ পালটে যাচ্ছে বাক্যের বিন্যাস; সমস্ত টালমাটাল অবস্থা কাটিয়ে কিন্তু বাংলাভাষা ঠিক উপযুক্ত রূপটি নিয়ে নেবে। যা হবে সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাংলাভাষার প্রাণের সঙ্গে যদি এদের যোগ না হয় তাহলে সেগুলি ছিটকে যাবে। ভাষা কারও কুক্ষিগত নয়।

বিশেষ নিবন্ধ

অমর ২১ মে ভাষা শহিদ দিবস

শিবানী দাস

১৯৬০ সালের ২৪ অক্টোবর অসম বিধানসভায় বাংলাভাষী ও অন্যান্য অসমিয়াভাষীদের গণতান্ত্রিক আবেদন উপেক্ষা করে পাশ হয়ে যায় অসমিয়া ভাষা বিল। সেই সময়ের অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা অসমিয়াকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সঙ্গত কারণে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে শুরু করল। উত্তর-করিমগঞ্জের বিধায়ক রনেন্দ্রমোহন দাস এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে শিলচরে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাংসদ চপলাকান্ত ভট্টাচার্য সম্মেলনের সভাপতি এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে আসন অলংকৃত করেন। করিমগঞ্জ থেকে প্রায় একহাজার পদযাত্রী শিলচর এসে সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। লক্ষ কণ্ঠে নিনাদিত হয়েছিল মাতৃভাষার জয়ধ্বনি। এই সম্মেলন থেকে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয় বাংলাকে অসমের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা করার জন্য। কিন্তু সব গণঅনুরোধ উপেক্ষিত, তাই গর্জে ওঠে সেদিনের কাছাড় অর্থাৎ বরাক উপত্যকা।

অসমিয়া ভাষা বিল পাশ হওয়ার পর ৬০-এর ডিসেম্বর মাসে নরসিংপুরে কাছাড় রত্ন রাজমোহন নাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় কাছাড় যোগী সম্মেলন। সম্মেলন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে অসমে আর থাকা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের ১৪ জানুয়ারি করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ এই তিন জেলা কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশন। এই সম্মেলনও ঘোষণা করে অসমের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে থাকা অসম্ভব। কিন্তু এইসব সম্মেলন কেবল প্রস্তাব পাশ করেই কর্তব্য সম্পাদন করে।

কংগ্রেস সম্মেলনের ২০ দিন পর ৫ ফেব্রুয়ারি করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হল একটি জনসম্মেলন। এই সম্মেলন শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। গঠিত হল গণ সংগ্রাম পরিষদ। এই সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল বাংলা ভাষাকে অসমের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই ভাষা আন্দোলন মূলত ছিল ছাত্র-যুবকদের আন্দোলন।

এদিকে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের এক সভায় ১৯৬১ সালের ১৫ এপ্রিল অর্থাৎ নববর্ষ দিবসকে সংকল্প দিবস রূপে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত কালসীমায় সভা, শোভাযাত্রা, পদযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণকে আন্দোলনমুখী করে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুসারে, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের নববর্ষ দিবসে সংকল্প দিবস উদযাপিত হয়। ১৯ এপ্রিল থেকে পদযাত্রীদের গ্রাম পরিক্রমা শুরু হল। রথীন্দ্রনাথ সেন, অরবিন্দ চৌধুরী, বিধুভূষণ চৌধুরী, ব্যোমকেশ দাস, অন্নদামোহন কর, প্রেমানন্দ মুখোপাধ্যায়, স্বদেশরঞ্জন ভট্টাচার্য, নলিনীকান্ত দাস, নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে পদযাত্রী দল সমস্ত করিমগঞ্জ, পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি ও বদরপুর থানার বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করার পাশাপাশি স্থানে স্থানে সভা করে ২ মে করিমগঞ্জ ফিরে এলেন। ফলে প্রতিটি গ্রামে ও গঞ্জে ভাষা সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান পৌঁছে গেল। ১৯ এপ্রিল শিলচর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীরা ধর্মঘট পালন করে এবং গান্ধীবাগে এক সভায় মিলিত হয়ে সংগ্রামের শপথ নেয়। ২৪ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত ২৫ জনের এক পদযাত্রী দল পরিতোষ পালচৌধুরীর নেতৃত্বে শিলচর মহকুমার গ্রামাঞ্চল পরিক্রমা করেন। হাইলাকান্দি মহকুমার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও প্রাণিত করতে একদল পদযাত্রী ১০-১৩ মে পর্যন্ত গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পরিক্রমা করেন।

২.৩৫ নাগাদ ১৭ রাউন্ড গুলি চালানোর ফলে শহিদ হলেন কুমারী কমলা ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রমোহন পাল, কানাইলাল নিয়োগী, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, কুমুদ দাস, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, হীতেশ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র সূত্রধর এবং সত্যেন্দ্র দেব।

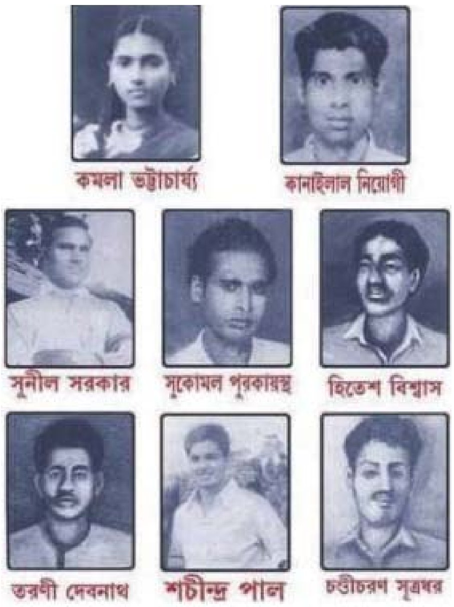

'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'র পণ নিয়ে ২ মে করিমগঞ্জে রথীন্দ্রনাথ সেন এক জনসভায় সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। এই কর্মসূচি ছিল '১৯ মে সর্বাত্বক ধর্মঘট ও পূর্ণ হরতাল। দোকানপাট, সরকারি বেসরকারি যানবাহন, অফিস-আদালত ইত্যাদি বন্ধ থাকিবে। অতঃপর সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থাতে অচল করিবার জন্য অন্যান্য পন্থা গৃহীত হইবে।'

দ্বিতীয় ঘোষণায় ছিল, 'বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষা করা এবং অন্যান্য অসমিয়া ভাষার যোগ্য মর্যাদা না দেওয়ার প্রতিবাদে করিমগঞ্জ পৌরসভার আসন্ন নির্বাচন বর্জন করিতে হইবে। এখন এই নির্বাচন আমরা হইতে দিব না।' প্রস্তাবিত সংগ্রামের রূপরেখা ঘোষণা করে অহিংস অসহযোগের পথ অবলম্বন করে সত্যাগ্রহ পালন করতে আহ্বান করা হয় সংগ্রামীগণকে। কাছাড় জেলা জুড়ে যখন ১৯ মে-এর প্রস্তুতি চলছিল, তখন প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ছিল না। জেলাবাসীর গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিকল্পনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, নানা কারণে করিমগঞ্জ সংগ্রাম পরিষদের কর্মতৎপরতায় প্রধান পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। তাই সংগ্রামীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনির কুচকাওয়াজ ও সত্যাগ্রহীদের প্রহারের কলাকৌশলের মহড়ার প্রদর্শন চলল প্রকাশ্যে।

১৮ মে গোপন সূত্রে জানা যায়, প্রশাসন নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার জন্য নীল নকশা তৈরি করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবাল-বৃদ্ধ-শিশুদের মুখেও 'জান দেব, জবান দেব না' স্লোগানটি ধ্বনিত হতে লাগল। জনশক্তির দৃপ্ত তেজ টগবগ করে ফুটতে লাগল। ১৯ মে-র পূর্বরাত্রে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করা হল।

শিলচরে নরেশ ভৌমিক, অনিল বর্মন, গোলাম ছবির খান ও শীতেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং করিমগঞ্জে রাতের শেষে রথীন্দ্রনাথ সেন, বিধুভূষণ চৌধুরী, নলিনীকান্ত দাস, যজ্ঞেশ্বর দাস, নিশীথরঞ্জন দাস, করিমগঞ্জ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি শান্তিময় ভট্টাচার্য, প্রেমানন্দ মুখার্জী ও বিজয় সেনকে বন্দি করা হয়। বিধায়ক গোপেশ নমশূদ্রকেও গ্রেফতার করা হল পাথাকান্দিতে। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন প্রভাতের পূর্বেই। এভাবে ১৯ মে-র প্রভাত উদয় হয় কাছাড় জেলায়।

ভোরের সূর্য ওঠার আগেই সত্যাগ্রহীরা পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ স্থানে মোতায়েন হলেন। করিমগঞ্জ ও শিলচর রেল স্টেশনে সত্যাগ্রহীরা ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিলেন। এমনকী শত শত সত্যাগ্রহী কারাবরণ করলেন। শিলচর স্টেশনে পুলিশী নির্যাতন চলল সত্যাগ্রহীদের ওপর। আহত সত্যাগ্রহীদের সেবার জন্য শিলচরে বিশিষ্ট জননেতা সতীন্দ্রমোহন দেবের বাড়ি রেডক্রসের উদ্যোগে সাময়িকভাবে হাসপাতালে পরিণত হয়েছিল। বেলা ২.৩০ মিনিটে পুলিশের একটি বন্দুক সত্যাগ্রহীরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন বলে গুজব ছড়িয়ে সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি বর্ষণ করা হল। ২.৩৫ নাগাদ ১৭ রাউন্ড গুলি চালানোর ফলে শহিদ হলেন কুমারী কমলা ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রমোহন পাল, কানাইলাল নিয়োগী, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, কুমুদ দাস, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, হীতেশ বিশ্বাস, বীরেন্দ্র সূত্রধর এবং সত্যেন্দ্র দেব। ২০ মে শহিদদের শবদেহ নিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিলেন সত্যাগ্রহী সহ আপামর জনগণ। এই ঘটনার পর অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

গণ-চেতনাকে সজাগ রাখা এবং জাগরণ ঘটানোর কাজ বড় দুরূহ। নিরাশ হৃদয়ে আশা সঞ্চারের মতো কঠিন কাজ আর কিছু নেই। কথার বদলে কাজের মাধ্যমেই এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করত হবে। তাই তো উনিশের চেতনায় জাগরিত হলেই উনিশের উত্তরাধিকার অর্জিত হয়। অধিকার অর্জিত হয় সাধনায়। আর এই সাধনা চেতনার জাগরনের সাধনা। এই চেতনা হল মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় প্রাণপণ সংগ্রামের অঙ্গীকার। ১৯ মে যে চেতনার নব অভ্যুদয়, সেই চেতনায় কবিগুরু ভারতকে জাগরিত করার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

কবি বলেছেন, 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর...'

আড়াল থেকে

জেনে শুনে বিষ করেছি পান

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

ভেজাল এখন সর্বত্র। দিনের শুরু ভেজাল দুধ দিয়ে। তাতে নাকি মিশ্রিত চকের গুঁড়ো, ডিটারজেন্ট, অ্যামোনিয়াম সালফেট, বোরিক অ্যাসিড, কস্টিক সোডা। হাঁস, মুরগীর খাবারে Astaxanthinমিশিয়ে ডিমের কুসুম টুকটুকে কমলা করার পদ্ধতিও বহুদিনের। আর ব্রেড? ময়দা নাকি সবচেয়ে বড় শত্রু আমাদের শরীরের। কারণ প্রোসেসিং-এর সময় সব নিউট্রিয়েন্টস ঝেড়ে পুছে ফেলে দেওয়া হয়। তবে ব্রাউন ব্রেড? বেশীরভাগ দোকানেই ব্রাউন ব্রেড ময়দা দিয়েই বানানো হয়। আর বাদামীর কারণ ক্যারামেল। উইকএন্ডে লং ড্রাইভে গিয়ে ধাবার খাটিয়ায় বসে মনের সুখে তন্দুরি রুটি আর মাংস খেয়ে সুখ ঢেকুর তোলেননি? তখন জানতেন ওই মাংস ভাগাড়ের মৃত পশুর?

তাহলে মুড়িই খান। সেখানেও মুড়িভাজার আগে নাকি ইউরিয়া মেশানো হয়। লম্বা লম্বা ধবধবে সাদা, ফুরফুরে জুঁই ফুলের মতো মুড়ি দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ি আমরা। অথচ গ্রামের মেয়েরা যে মুড়ি নিয়ে বাজারে বসে সেগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা, লাল মুড়ি। সেগুলোর দিকে ফিরে চাই না। পহেলে দর্শণধারী চাই যে আমাদের।

চা-পাতায় রং করা কাঠের গুঁড়ো, লোহার গুঁড়ো। এবার চাল- সেখানেও পাউডার মেশানো। সবজিতেও পর্যাপ্ত পেস্টিসাইড। তুঁতে গোলা জলে সবজি! টাটকা, সবুজ দেখাবে যে বহুক্ষণ। মাছ? সেখানেও বাইরে থেকে রোডামিন বি ইঞ্জেক্ট করা কানকোর মধ্যে। মাছ তাজা দেখাবে তাই।

আর বিশেষ রোগে আক্রান্ত মরা মাছ সস্তায় কিনে এনে সস্তায় বিক্রি করা বা মরা চিকেন ফরমালিন দিয়ে তাজা রাখার কৌশল ব্যাবসায়ীরা খুব ভালোই আয়ত্ত্ব করেছেন।

এই সেবার ম্যাগি নিয়ে গেল গেল রব উঠল। হেলে ধরতে পারি না, কেউটে ধরতে যাই আমরা।

ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া নামে একটি খাদ্য নিয়ামক সংস্থা আছে। কিছুদিন আগে যারা ম্যাগির মধ্যে নিষিদ্ধ সীসা আর আজিনামোট পাওয়ার পর ম্যাগির গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়ল। আচ্ছা তারা দেখতে পান না রাস্তার মোড়ের তেলেভাজা কিংবা কচুরি ভাজার দোকানের তেলের রং? বারেবারে উচ্চ তাপমাত্রায় তেল গরম করলে HNEনামক যৌগটি ডিপ ফ্রায়েড ফুডে শোষিত হতে থাকে যা দীর্ঘদিন সেবন করলে কার্ডিওভাসকুলার এবং নিউরোডিজেনারেটিভ রোগের সৃষ্টি করে।

সবজির বাজারে উচ্ছে, পটল বা কাঁকরোলকে তুঁতের জলে ডোবানো? তুঁতে মানে কপার সালফেট। নির্ভেজাল বিষ মশাই। পোকা মারার অব্যর্থ দাওয়াই। মানে যাকে বলে ইনসেকটিসাইড।

মাঝে মাঝেই কর্মকর্তারা নড়েচড়ে বসেন খাদ্যের মান নির্ধারণ নিয়ে। কমিটি গঠন হয়। সবজিতে রং মিশিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে ব্যাপারী। টিভি চ্যানেলে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এগুলি জামিন অযোগ্য অপরাধ বলে। তারপর চুপচাপ। কোয়ালিটি কন্ট্রোল হবে, অপরাধীর সাজা হবে।

নাগরিক স্বাস্থ্য বলে কথা!

ফুটপাথে ফার্স্ট ফুডের রমরমা চলতেই থাকবে? মরুক মানুষ। মরুক সমগ্র জাতি। তৃতীয় বিশ্বে এমনি হবে। বিদেশে কিন্তু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের বিশেষ সেল থাকে। তারা গুণমান দেখে। আর আমরা কিনা দেখি হোটেলের সিংকের নীচে স্তূপীকৃত নুডলস সেদ্ধতে আরশোলার সানন্দে চরে বেড়ানো। নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাব প্রায়শই দেখি নড়েচড়ে বসেন। লম্বা-চওড়া বাতেলা আওড়ান। কিন্তু তারপরেও কচুরি ভাজার তেলটি বদলানো হয় না দিনের পর দিন। আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিটা কি তবে এমনি থাকবে? আমরাও ঘুমে অচেতন থাকব?

হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে মিশ্রিত থাকে হলুদের চেয়েও উজ্জ্বল কার্সিনোজেনিক লেড ক্রোমেট। আর টকটকে লাল লঙ্কার গুঁড়োয়? লাল cayenneপাউডার মেশানো হয়। এই রং না মেশালেই নয়? আজ কি তাই ঘরে ঘরে এতো কিডনির অসুখ? রান্নাঘরে এমন থই থই ভেজাল আমাদের! এছাড়া ওই সব মনোহারী শরবত বা দর্শনধারী বোতলবন্দী পানীয়! গ্রিন ম্যাঙ্গোয় ম্যালাকাইট গ্রিন, টুকটুকে লাল গোলাপের মতো পানীয়তে কঙ্গো রেড বা এলিজারিন! এ-সব রাসায়নিক আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। ভোজ্য সর্ষের তেলে রেড়ির তেল, শিয়ালকাঁটার তেল, আর্জিমোন অয়েলের উপস্থিতি তো সর্বজনবিদিত। সেও তো ড্রপসি, অষ্টিও আরথাইটিসের কারণ। বেসনের মধ্যে খেসারির ডালের গঁড়ো? সেও তো মারাত্মক। গোলমরিচের মধ্যে পেঁপের শুকনো বীজ মিশিয়ে দেওয়া? জানেন এইসব কারণেই লিভারের সমস্যা থেকে দৃষ্টিশক্তি, নার্ভ থেকে আর্থাইটিস এসব রোগ অপ্রতিরোধ্যভাবে বেড়েই চলেছে।

এ যুগের আরেকটা হাইফাই ব্যাপার হল সুগার ফ্রি মিষ্টি। চিনির বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত স্যাকারিন সস্তা কিন্তু ব্যানড বহুদিন। বিকল্প খাবেন না। আর মন না মানলে একটু চিনিই খান। সুগার ফ্রি নৈব নৈব চ। সর্বত্রই জেনেশুনে বিষ পানের বিশাল আয়োজন। টিভি বলবে জাগো গ্রাহক জাগো। ক্রেতা সুরক্ষার কচকচি আওড়াবেন নেতারা। কিন্তু শরীর আমার। স্বাস্থ্যও আমার। সেখানে নো কম্প্রোমাইজ।

বিশ্বসংস্থার স্বাস্থ্য রিপোর্টে আবারও হুঁশিয়ারি। চাপান-উতোর। জলঘোলা। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেও ভবি ভোলার নয়। অতএব জুভেনাইল হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, ক্যানসার ইত্যাদি মারণ রোগের বাড়বাড়ন্ত, এটাই সত্য। ওবেসিটি আজকের সমাজের অভিশাপ। এও সত্য।

এখন আবার শুনছি একজনের এঁটো পাতকুড়োনোও দিব্য চালান হচ্ছে অন্যের প্লেটে। রেস্তোরাঁর ফ্রিজের খাবার-দাবারে নাকি পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাংগাস থাকছে। টেলিভিশনে টক শো। হট কেক টপিক। দেখেছেন তো? হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা। রেস্তোরাঁর ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করেঙ্গা। চার্জশিট পেশ। জরিমানা, কারাবাস। আবার সব ধামাচাপা।

আর কত বলব? স্বনামধন্য ফুড ব্র্যান্ডে চানাচুরে নাকি বহুদিন কুড়মুড়ে রাখার জন্য মার্বেল ডাস্ট মেশানো হয়। অথবা কেশরী বিরিয়ানী কিংবা রাবড়িতে মেটানিল ইয়েলো। যেটি এটি ক্যানসারকারক কেমিক্যাল। তবে এবার যারা সক্কলকে ঘোল খাইয়েছেন, ভাগাড়ের পচা মাংস বেঁচে তাদের রাজ্যশ্রী অ্যাওয়ার্ড দেওয়াই যায় সাহসের জন্য।

হিমঘরে উদ্ধার হওয়া এই মাংসের মধ্যে কুকুরের মাংসও রয়েছে। বজবজ থেকে রাজাবাজার, ধাপার মাঠ থেকে সোনারপুর, এমনকী বিহার অবধি ব্যাপ্তি এই মাংস চক্রের। এজেন্ডা হল এমনি। পশুর মৃত্যু, কোল্ড স্টোরেজ, কেমিক্যালস প্রয়োগ, আবারও হিমঘর তারপর প্যাকেজিং। ব্যস! আমআদমীর ঘরে পৌঁছে যাওয়ার সুনিপুণ ব্যবস্থা।

লজ্জা, ঘেন্না, ভয়, এই তিনের কোনওটিই নেই এই চক্রের। অতএব ব্যবসার খাতিরে গো! যতদিন না ধরা পড়ছি লজ্জাই বা কীসের, ভয়ই বা কেন আর ঘেন্না? ওসব থাকলে কেউ ভাগাড়ের মাংস মানুষের খাবারের জন্য ভাবতে পারে? ছিঃ!

কিছু মানুষের অবশ্য ভাবখানা এমন যে, ঠিক আছে ক'দিন মাংস খাব না বাবা। তারপর? তার আর পর নেই। পচন ধরা আমিষ অথবা কৃত্রিম রং মেশানো খাবার-দাবার, সব গা সওয়া আমাদের। অতএব যা চলছে চলুক। তৃতীয় বিশ্বের চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকদের এমনই প্রাপ্য।

আবার স্যাম্পেল এনালিসিস হবে। ঠগ বাছার প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। কসাই ধরপাকড় হবে। ফরেনসিক এক্সপেরিমেন্ট হবে। সেই চক্র ছাড়াও পাবে। আপনার আমার নাকের ডগায় আবার বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে তারা।

একদিন এ ঝড় ঠিক থেমে যাবেই। পৃথিবী আবার শান্ত হবেই। মাংসাশী মানুষ তখন আবার জোর কদমে ঘেন্না, ভয় ভুলে মাংসের ঝোল খাবে কবজি ডুবিয়ে। বলবে খেয়ে তো নি আগে, তারপর দেখা যাবে। জেনে শুনে বিষ পান? ওসব রবিঠাকুরের কাব্যেই হয়। আমাদের কী এসে যায়?

বিশেষ কারণবশত এই সপ্তাহে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক কলাম 'স্মৃতিকথা' এবং অভিজিৎ চৌধুরীর ধারাবাহিক উপন্যাস 'অগ্নিঋষি' প্রকাশ করা সম্ভব হল না। লেখা দুটি আগামি সপ্তাহ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

বিশেষ নিবন্ধ

বিশ্বদরবারে মানুষ রবীন্দ্রনাথ

অরিজিৎ মৈত্র

কমার্শিয়াল গোত্রের একটি ছবির দৃশ্য। নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ চলেছে। নায়ক মোটেই সুপুরুষ নন, তবে বাংলা ছায়াছবির কমেডি রোলে এবং পার্শ্বচরিত্রে তিনি জনপ্রিয় অভিনেতা বটে। অবশ্যই রোম্যান্টিক চরিত্রে তিনি বেমানান। যাইহোক, আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ছবির ওই বিশেষ সিকোয়েন্সে নায়িকা নায়ককে অবিরত অনুরোধ করে চলেছে একটা কবিতার জন্য। কিন্তু কবিতা নামক ভয়াবহ বস্তুটির প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ার জন্য নায়ক হঠাৎই বলে বসলেন, 'দূর কী বলব, কিছুই মাথায় আসছে না। বুড়োটা আগে থাকতেই সব বিষয় নিয়ে লিখে বসে আছে।' এই সংলাপ শুনে হঠাৎ স্তম্ভিত হতে হয়, মনে হয় কী ভীষণ সত্যি কথা!

মানবতাবাদী কবি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যার তীর্থপ্রাঙ্গণে। মনে করতেন তিনি পৃথিবীর কবি। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তাঁর যত উঠে ধ্বনি, আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনই, এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক, রয়ে গেছে ফাঁক। কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান, কত না নিস্তব্ধক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।'

সমগ্র বিশ্ব চরাচর, সাতটি ঋতু, সর্বোপরি জীবনের প্রতি শাখার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখনীতে। সত্তরতম জন্মোৎসবে 'দ্য গোল্ডেন বুক অব টেগোর'-এ প্রকাশ করবার জন্য আইরিশ কবি ডব্লিড বি ইয়েটস কবিকে এক পত্র প্রেরণ করেন। তাঁকে অভিনন্দিত করে চিঠির এক জায়গায় ইয়েটস লিখেছেন, 'আই অ্যাম স্টিল ইওর মোস্ট লয়াল স্টুডেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমায়ারার।' আবার অন্যদিকে দেখতে পাই বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন রবীন্দ্রপ্রশস্তি করে বলেছেন, 'সায়েন্স ইউজেজ ল্যাঙ্গুয়েজ মিয়ারলি টু কনভে ইনফর্মেশন। লিটারেচার মেকস উইথ ওয়ার্ডস আ গার্মেন্ট হুইচ হাফ কাভার্স অ্যান্ড হাফ ডিসপ্লেস দ্য সাবটাইল অব হিউমেন থট।' রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষত্ব এইখানেই। রচনার নির্যাসের মধ্যে ফুটে ওঠে গণিতজ্ঞ চন্দ্রশেখরের ভাবনা। বহু শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যের মানুষ কালীদাস বা শঙ্করাচার্যের বিষয়ে অবগত ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানলেন, চিনলেন, অন্তরে গ্রহণ করলেন, যখন 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ করলেন স্বয়ং কবি। আর সেই গ্রহণযোগ্যতা পরিপূর্ণতা পেল ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাপ্তির মাধ্যমে।

এর ঠিক আট বছর পরে কবির সঙ্গে যোগাযোগ হয় চেকোস্লোভাকিয়ার মানুষের। ১৯২১ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথের আগমনবার্তা সেই দেশের সব পত্র-পত্রিকাতেই ঘোষিত হয়। এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পূর্বেই ঘটেছিল তাঁর রচনার মাধ্যমে। গীতাঞ্জলির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল এবং মহাযুদ্ধের ভয়াল দিনগুলোতে বিরাট এক তাৎপর্য এনে দেয় এই বই চেকসৈন্যদের কাছে, সাক্ষী তাঁর চেক প্রকাশকদের কাছে লিখিত পত্র। 'গার্ডেনার', 'ক্রেসেন মুন', 'চিত্রা', 'কিং অব দ্য ডার্ক চেম্বার', 'ঘরে বাইরে', 'সাধনা' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁরা পড়েছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আগমনের পাঁচ বছর বাদে তিনি দ্বিতীয়বার আসেন। তাঁর সেই সফরও অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে, ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম যে ফরাসি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পাঠ শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেন তিনি হলেন ১৯৬০ সালের নোবেল লরিয়েট, বিখ্যাত ফরাসি কবি স্যাঁ-জন্ প্যার্স। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁকে এতদূর অভিভূত করে যে তিনি অবিলম্বে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-র প্রথম সংস্করণের এককপি পাঠিয়ে দেন ফ্রান্সে, তাঁর বন্ধু খ্যাতনামা সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ্-এর কাছে। ১৯১২ সালেই জিদ্ 'গীতাঞ্জলি'-র ফরাসি অনুবাদ সম্পন্ন করে ফেলেন। সহজ কথা যায় না বলা সহজে। কিন্তু সহজ ভাষায়, সরল অভিব্যক্তির মাধ্যমেই তো পৃথিবীর কবি জীবনের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের কাছে। মুসোলিনীর চাতুরী ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন নিজের ভুল বোঝাকে। ইতালির শাসক সম্পর্কে ভুল বার্তা প্রকাশ পেয়েছিল কবিকণ্ঠে।

ইউরোপ ভ্রমণে ছন্দপতন ঘটেছিল। ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলেও রোমা র‍্যাঁলা, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, বার্নাড শ, কস্টিস পালামস, সিলভা লেভী, মহাত্মা গান্ধী তাঁর বার্তা গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ওয়ার্ল্ড পিস কুড ওনলি বি অ্যাচিভড থ্রু ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন বিটুইন ন্যাশনস।' মিউচ্যুয়াল ডেস্ট্রাক্টিভনেসের বিরোধী ছিলেন তিনি। লিখেছিলেন, 'কেন এ হিংসা, দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান-অভিমান।' সম্ভবত এই ভাবনার থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বভারতীর। উদ্দেশ্য 'যত্রবিশ্বম ভবতি একনীড়ম', যেখানে সমগ্র বিশ্ব একই বৃক্ষের তলায় একত্রিত হবে। কবির ডাকে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে সেখানে যুক্ত হয়েছিলেন চার্লস অ্যান্ড্রুজ, উইলিয়াম পিয়ারসন, লিওনাড এলেমহার্স্ট, তান সাহেব প্রমুখ। ১৯২৯ সালে ভাইসরয় লর্ড আরউইন এক ব্যক্তিগত চিঠির মাধ্যমে কবিকে অনুরোধ করেন কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে টেরিয়েনিয়াল এডুকেশনাল কনফারেন্স অন এডুকেশন অ্যান্ড লেজার সম্মেলনে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য। সেই যাত্রায় কবির সঙ্গী হয়েছিলেন এ কে চন্দ, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রেভারেন্ড বয়েড টকর এবং অ্যান্ড্রুজ সাহেব। ভাইসরয়ের অনুরোধ রাখলেও কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কবির কলম বারে বারে সক্রিয় হয়েছে। সেই বিষয়ে তিনি কোনও আপোশ করেননি। পারস্পরিক সহযোগিতা ও একতার মনোভাবের বাণী তিনি দেশনেতাদের মধ্যে প্রচার করেছেন।

অমৃতসর হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সময়ে যখন ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট বহাল ছিল, তখন কিন্তু সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদসভা আয়োজন করার ক্ষেত্রে তিনি কোনও জাতীয় নেতাকেই পাশে পাননি। তখন একলা চলার পথ ধরে ভাইসরয়কে পত্র লিখে 'নাইটহুড' ত্যাগ করেছিলেন। লিখেছিলেন, 'আই ফ্রম মাই পার্ট উইশ টু স্ট্যান্ড শোন অব অল স্পেশাল ডিস্টিংগুইসেস বাই দ্য সাইড অব মাই কান্ট্রিমেন হু ফর দ্য সো কল্ড ইনসিগ্নিফিকেন্সেস লায়বেল টু সাফার ডিগেডশনস নট ফিট ফর হিউম্যান বিয়ং।' ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবি বুঝতে পেরেছিলেন আগামীর ভারতভাগ্য।

এর পরের দশ বছর আশ্রম বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে কবি বিশ্বভ্রমণ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাঁকে সাদরে আহ্বান জানায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বের অবস্থা কবির মনকে ব্যথিত করে। মংপু সফরকালে মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী মনোমোহন সেন রোজ সকালে কবিকে শুনিয়ে যেতেন চিনের দুর্দশার কথা। সেইসব খবর শুনে কবির মনে হয়েছিল সারা বিশ্বের দুর্দশার কাছে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি কী অকিঞ্চিৎকর। তাঁর বিশ্বাস ছিল ইউরোপের মাটি থেকেই সভ্যতার আলো বিশ্বকে পথ দেখাবে। কিন্তু বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে কবির সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে। তবুও শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত আশিতম জন্মদিনের লিখিত ভাষণে তিনি জানিয়েছিলেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।'

মানবতাবাদী কবি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যার তীর্থপ্রাঙ্গণে। মনে করতেন তিনি পৃথিবীর কবি। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তাঁর যত উঠে ধ্বনি, আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনই, এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক, রয়ে গেছে ফাঁক। কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান, কত না নিস্তব্ধক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।'

ছোটগল্প

কালপুরুষ

সঙ্গীতা মাইতি

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে মিমি ভাবছিলো, আজকে মা'কে কথাটা বলেই দেবে- স্কুলে টিফিনের সময় একটা আঙ্কেল মাঝেমাঝে এসে তার সাথে গল্প করে, চকলেট দিয়ে যায়। কিন্তু মা যখন শুনবে, অজানা-অচেনা কারো থেকে সে চকলেট নিয়েছে তখনই মা বকাবকি শুরু করবে। তার চেয়ে বরং কথাটা না বলাই ভালো। পিঠের ব্যাগটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে সে। তারপর কাজের মাসিকে ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করে- ''মা কখন ফিরবে বলেছে?'' মাসি জানায়- ''আজও ফিরতে রাত হবে।' এ কথা শুনে, কিছুটা নিরাশ হয়ে মিমি শোবার ঘরে চলে যায়।

শিশুতীর্থ নার্সারি স্কুলে ক্লাসফোরে পড়ে মিমি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে জেনে এসেছে তার বাবা নেই। তার মা নাকি সিঙ্গেল মাদার। সিঙ্গেল মাদার মানে জানে না মিমি। তাই বন্ধুরা যখন তার বাবার কথা জানতে চায় কিছু বলতে পারে না সে। বন্ধুরা হাসাহাসি করে। স্কুলে 'পেরেন্টস ডে'-তে যখন তার সব ক্লাসমেট বাবা-মা'র হাত ধরে ঘোরে মিমির খুব খারাপ লাগে। শুধু তাই নয় যখন তার বেস্টফ্রেন্ড রুমি স্কুল ছুটির পর বাবার বাইকের পিছনের সিটে বসে তাকে টা টা দিতে দিতে বাড়ি চলে যায়, তখন মিমির ভিতরটা দুমড়ে- মুচড়ে যায়। তার যদি একটা বাবা থাকত! তবে কত আদরই না পেতো সে! মায়ের বকাঝকার হাত থেকে, হোমটাস্ক থেকে সহজেই রেহাই পেয়ে যেতো মিমি। বিকেলে বাবার হাত ধরে সে পার্কে গিয়ে খেলা করত। আর তার জন্মদিনে স্কুলের সব বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে দেখিয়ে দিত, তার বাবা তাকে কত্ত ভালোবাসে। মিমির চিন্তায় ছেদ পড়ে কাজের মাসির ডাক শুনে। সে নিচে গিয়ে দেখে কাজের মাসি, হাতে একটা ছোটো টেডিবিয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথা থেকে এল এই টেডিবিয়ারটা জানতে চাইলে, কাজের মাসি বলে একটা লোক এসে নাকি, তাকে দিয়ে বললো, এটা মিমিকে দিতে। মিমি আন্দাজ করতে পারে লোকটি আসলে সেই স্কুলের 'ভালো আঙ্কেল'। হ্যাঁ, এই নামেই তো তাকে ডাকে মিমি। কিন্তু কাজের মাসিকে কিছু জানালো না। তার হাত থেকে টেডিবিয়ারটা নিয়ে ওপরে চলে গেল।

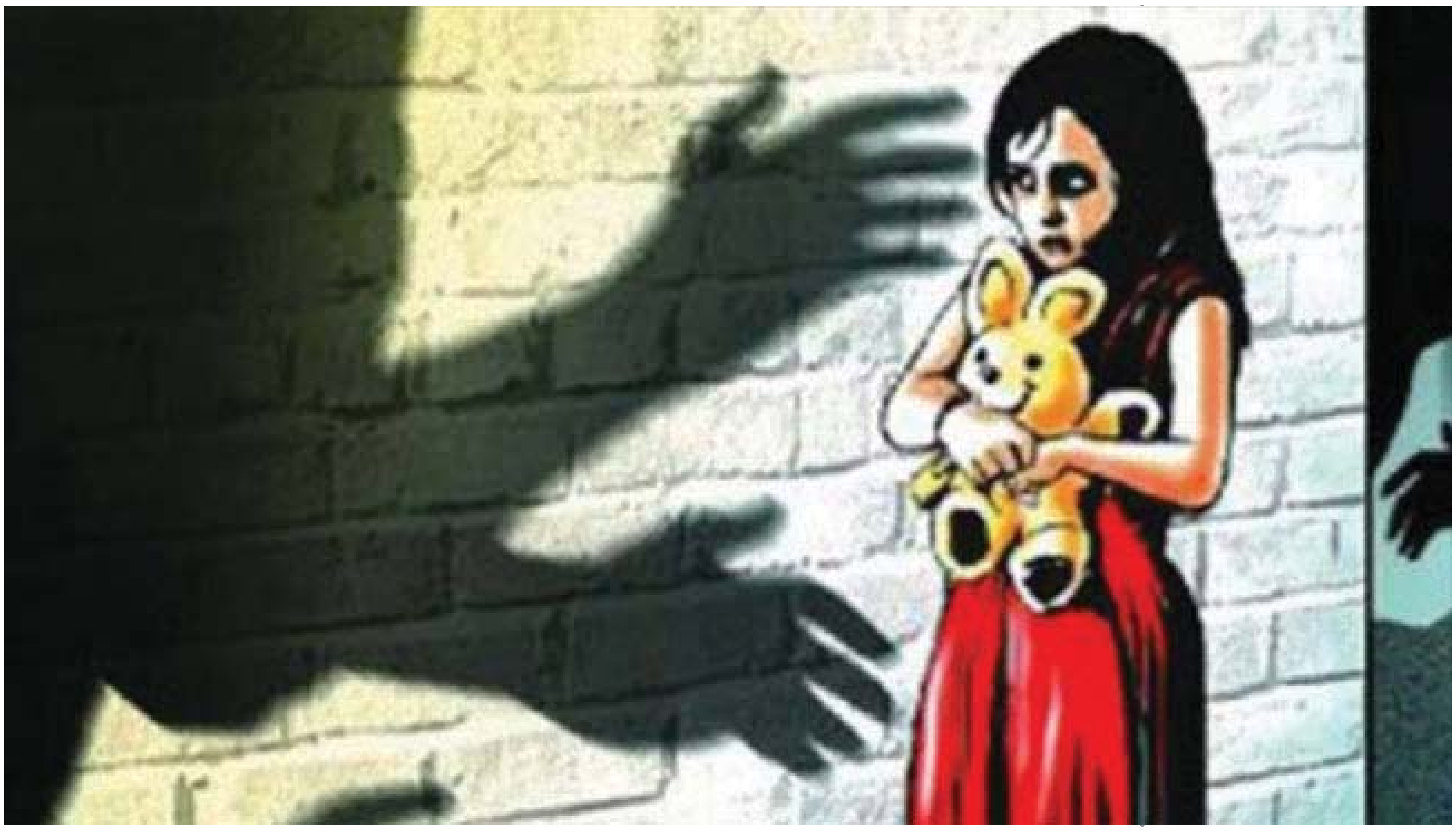

সত্যিই তো ভালো আঙ্কেল কত খেয়াল রাখে মিমির। টেডিবিয়ার কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে সে, মিমিকে ভালোবাসে বলেই তো! মিমি মনে মনে ভাবে ভালো আঙ্কেল যদি ওর বাবা হতো তবে কি মজাই না হতো। লজেন্স, বিস্কুট, চকলেট, টয় যখন যা চাইতো পেয়ে যেত। ভালো আঙ্কেলকে দেখলেই কেমন যেন বাবা বাবা মনে হয় মিমির। চোখগুলোয় মায়া জড়ানো। এই তো ক'দিনের পরিচয় কিন্তু কথা বললে যেন মনে হয় কতদিনের চেনাজানা। লম্বা, ফরসা, হালকা দাড়ি, পাঞ্জাবির লম্বা হাতার শেষে একটা কালো বেল্টের ঘড়ি, চোখে ফ্রেম দেওয়া চশমা। মায়ের পাশে ভালো আঙ্কেলকে দিব্যি মানিয়ে যাবে- ভাবতে ভাবতে মিমি ব্যাগের চেন থেকে চকলেটগুলো বার করে আর একবার গুনে নেয়, তারপর টেবিলের শেষ ড্রয়ারটায় টেডিবিয়ার আর চকলেটগুলো রেখে দেয় সাবধানে। যাতে তার গোপন স্নেহের হদিশ কেউ না পায়।

মিমির মা অর্থাৎ ড. সুপর্ণা চৌধুবীর বয়স চল্লিশ। কাজের চাপে মিমিকে সেইভাবে সময় দিতে পারেন না। রাতে মা না ফেরা পর্যন্ত সে জেগেই থাকে। আজ মা ফেরার পর মিমি তাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে আর বলে- 'মা, আমার কেন বাবা নেই মা? বন্ধুরা আমায় রোজ কত প্রশ্ন করে আমি কিছু বলতে পারি না ওদের।' সুপর্ণাদেবী মিমিকে কোলে তুলে নিয়ে কপালে একটা চুমু দিয়ে বলেন- ''তোমার বন্ধুদের বলবে, আমি তোমার মা, আমিই তোমার বাবা।' ভালো আঙ্কেলের কথা বলতে গিয়েও মিমি থমকে যায়, পাছে মা বকে। তারপর মায়ের সাথে খেতে বসে সে। তার স্বপ্নের জগৎটা অধরাই রয়ে যায়, ডাইনিং টেবিলে বাবার জন্য বরাদ্দ ফাঁকা চেয়ারটায়।

পরের দিন সকালে স্কুলগাড়িতে উঠে মায়ের হাত নাড়া দেখতে দেখতে মিমি ভাবে ভালো আঙ্কেল তার বাবা হয়ে গেলে, ভালো আঙ্কেলকে সে রোজ স্কুলে দিয়ে যেতে বলবে। দু'টো ক্লাসের পর ওদের টিফিন হবে। আজ, ভালো আঙ্কেলকে সে বলেই দেবে বাবা হওয়ার কথা। ভালো আঙ্কেল শুনলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। মিমিকে জড়িয়ে ধরে আদর করবে খুব।

অঙ্কের ক্লাসে মিমির মন বসছিল না। বারবার মনটা স্কুলের পাশের পুরানো বটগাছের চাতালটার দিকে চলে যাচ্ছিল। যেখানে ভালো আঙ্কেলের সাথে সে রোজ টিফিনের সময় বসে গল্প করে। ভালো আঙ্কেল কত কত গল্প জানে- রূপকথার গল্প, বাঘ, হরিণ, কুমির এমনকী ভূতের গল্পও জানে। হঠাৎ মিমির মনে হয়— এই রে ভালো আঙ্কেলের নামটাই জানা হয়নি। আজ নিশ্চয়ই নামটা জানবে সে, অবশ্য জেনেই-বা কী করবে। তাকে তো বাবা বলে ডাকবে ঠিক করেই ফেলেছে মিমি।

টিফিনের ঘণ্টা পড়ার পরই সে ছুটে যায় স্কুলের পাশের বটগাছটার তলায়। কিন্তু কই, ভালো আঙ্কেল তো আজ আসেনি। এখানেই তো তার জন্য অপেক্ষা করে ভালো আঙ্কেল। তারপর মিমি অনেকক্ষণ বসে থাকে বটতলার চাতালটায়। হঠাৎ কোথা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রুমি এসে মিমিকে ঠেলা মেরে বলে-'প্রিন্সিপ্যাল ম্যাম তোকে ডাকছেন। তোর মাকে দেখলাম প্রিন্সিপ্যাল স্যারের ঘরে যেতে।' নানা প্রশ্ন ঘুরতে থাকে মিমির মাথায়। হঠাৎ তার মা কেন স্কুলে এলেন? তবে কি কোনোভাবে তার মা ভালো আঙ্কেলের কথা জানতে পেরেছেন? তাই হয়তো ভালো আঙ্কেলের নামে তার মা রিপোর্ট করতে স্কুলে এসেছেন। সেই মুহূর্তে মা'কে খুব পচা বলে মনে হয় মিমির। আস্তে আস্তে হেঁটে যায় প্রিন্সিপ্যালের রুমের দিকে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে তার মা আর প্রিন্সিপ্যাল ম্যামের কথাবার্তা শুনতে পায়। মিমি তার মাকে বলতে শোনে, 'ওরা আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করে নেয়নি তো?' প্রিন্সিপ্যাল ম্যাম বলে ওঠেন, 'চিন্তা করবেন না, ওরা স্কুল থেকে কাউকে তুলে নিয়ে যেতে পারবে না।' মিমির মা উচ্চস্বরে বলে ওঠেন, 'আপনি জানেন না, ওই একইরকম চকলেট, টেডিবিয়ার আমার মেয়ের ড্রয়ার থেকে পেয়েছি আমি। সকালে টিভি না চালালে কিছু জানতেই পারতাম না।' প্রিন্সিপ্যাল ম্যাম বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, প্রতিটা বাচ্চাকে এইভাবে চকলেট, টেডিবিয়ারের লোভ দেখিয়ে কিডন্যাপ করা হচ্ছে। আমরা পুলিশের কাছে জানিয়েছি। আমাদের স্কুলের দুটো বাচ্চাকে এখনো উদ্ধার করা যায় নি।'

দরজায় দাঁড়িয়ে মিমি থ হয়ে যায়। যে তাকে বাবার মতো স্নেহ করতো, সেই ভালো আঙ্কেল আসলে একজন কিডন্যাপার! সুপর্ণাদেবী মেয়েকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন। তার মাথায়, গায়ে হাত বুলিয়ে বলেন-'তুমি ঠিক আছো তো মিমি সোনা?' মিমি কিছু বলতে পারে না। শুধু ঘাড় নাড়ে। সুপর্ণাদেবী তবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন না। প্রিন্সিপ্যাল ম্যামকে বলেন-'যদি অনুমতি দেন, তাহলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এখনি আমি বাড়ি ফিরবো। ওর ট্রিটমেন্ট দরকার।'

মায়ের হাত ধরে স্কুলের পাশ দিয়ে বড় রাস্তার দিকে যাবার সময়, মিমি বটগাছটার শূন্য চাতালটার দিকে ফিরে তাকায়। তারপর, মায়ের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে। দরদর করে তার দু'গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। দু'হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে মিমি বলে ওঠে- 'মা আমি আর কোনওদিন বাবা চাইবো না... কোনওদিন না...।'

শারদীয়া সংখ্যার লেখা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ মে ২০১৮

রবিবারের বৈঠক
যুগশঙ্খ
SUPPLI
রবিবার, ২০ মে ২০১৮

ক বি তা

আমার উনিশ, আমার নাগরিকতা, ২০১৮

সৌমিত্র বৈশ্য

আলোকিত বিপণীটির সামনে, যে-তরুণটি তার বান্ধবীর সাথে স্বপ্নে মশগুল, তাদের আলাপের ভাষা আলচিকি বা কোকবরক বা ডিমাসা নয়; এমনকি বাংলাও নয়। প্রতিদিন মধ্যরাতে তাদের ভাষার জন্ম হয়, বিলবোর্ডে, টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে, ফেসবুকের নিজস্ব টাইম লাইনে, টুইটারে; আর তা নৈশ প্যাঁচার মত ডানা মেলে উড়ে যায়, কসমোপলিটান সংসর্গের দিকে। শুধু একটি গাঢ়-আকাশী-নীল বুড়ো আঙুল দেখানো বিশাল দৈত্য, তার অপছন্দ-পছন্দমাফিক সাজিয়ে রাখে, আমাদের অবশিষ্ট পৃথিবী।

#

এনআরসি সেবাকেন্দ্রের সামনে যে লোকটি উদ্বিগ্ন মুখে, গালে না কামানো খোঁচা খোঁচা সাদা কালো দাঁড়ি নিয়ে বসে আছে, সে আমার বাবা। ১৯৪৭-এর উদ্বাস্তু। তার একটাই ভাষা, উদ্বেগ আর জঠর-জোড়া ক্ষুধা। হাটে-বাজারের, লেনদেনের ভাষা ছাড়া সে আর অন্য কোনো ভাষা জানে না। তারচেয়ে বড় কথা সে শুধু পূর্ব বাংলায় যে গ্রামে তার ভিটে ছিল, তার পাশের হাওরের বাতাসের ভাষা এখনও ভোলেনি। কিন্তু সে উনিশের ভাস্কর্যের শিল্প-সৌকর্য কাকে বলে, তা জানে না। এমনকি নাগরিক কৃষ্ণচূড়া উৎসবের নামও জানে না। আমার বাবা শুধু শুনেছে ডিটেনশনক্যাম্পের নাম।

#

আর আমি, না স্বপ্নিল তরুণ, না বাবার মত হাওর দাপানো মানুষ, খানিকটা পুঁথি খেয়ে, ফলতঃ সৌখিন সংশয়বাদী, কিন্তু জেনে গেছি নিশ্চিত, সামনেই আমারও বধ্যভূমি রচিত হয়েছে। আউশভিৎস জ্বলে উঠবে। আর আমি, আমার বাবা, চুল্লির মুখ গলে দেশহীন, কালহীন, সীমান্তের কাঁটাতারহীন, নির্ভার মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ব আসামে, মেঘালয়ে, চেরাপুঞ্জির বৃষ্টির মত। থলুয়া মেঘ হয়ে ঝরে পড়ব খিলঞ্জিয়া লুইতের বুকে। সত্রে সত্রে স্তোত্র পাঠ হবে, নামগান হবে। আমার বায়বীয় আত্মাও গাইবে জয় আই অহম, জয় আই অহম।

পাতায় পাতায় আগুনের ফিসফিস

অমিত সাহা

নতুন বানান শেখা ঠোঁটের মতো কাঁপছে
বসন্তের পাতা,
পাতায় পাতায় স্বরবর্ণ-রোদ !
ডালে ডালে বৈশাখী-ব্যঞ্জনা ।

পাখিদের ডানায় ঝাপট মারছে অনন্ত সম্ভাবনা!

পাতাদের প্রচ্ছদে ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লোরোফিল
হে স্বপ্নকাঙাল! আগুন দেখেছ
দ্যাখোনি সলতেতে নিঃস্ব হওয়া কেরোসিন!

অক্ষরের আত্মত্যাগে দেখি প্রতিটি পাতায় ভাষাসংশ্লেষ,
হাইফেনের মতো হাত বাড়ানো ডালের
পিঁপড়ে সারিতে আজো দুর্ভিক্ষই আঁকা।

নিভন্ত মোমবাতি থেকেই প্রথম গুমরাতে শেখা।

বটের ঝুরিতে নেমে আসা অন্ধকারে আজো শুনি-
নিভে যাওয়া সলতেতে আগুনের ফিসফিস
আমরা উনিশ...
আমরা উনিশ...
আমরা উনিশ...

প্র ব ন্ধ

ভাষার মৃত্যু সংস্কৃতির মৃত্যু

দেবাংশু ঘোষ

কেমন করে জন্তু-জানোয়ারদের কণ্ঠোচ্চারিত শব্দ থেকে একদিন মানুষের ভাষার সৃষ্টি হল, সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে না কোনওদিনই। 'Homo' প্রজাতির প্রারম্ভে, প্রস্তরযুগে নাকি আধুনিক মানুষের উৎপত্তির সঙ্গে ঠিক কখন ভাষার উৎপত্তি তা ভাষাতাত্ত্বিকরা এখনও খুঁজে চলেছেন। ভাষার এই উৎপত্তি যখনই হোক তা যে মানুষের এক বিশেষ ক্ষমতা সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বহুদিনের বহু চেষ্টায় যা অর্জিত হয়েছে তা অসাবধানতায় হারিয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। একটি পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, মোট ৪২,১৯২টি ভাষার মধ্যে আজ ৬৯১২টি ভাষা এক অর্থে জীবিত। ২০০৬ সাল থেকে প্রতি বছর অন্তত তিনহাজার ভাষার মৃত্যু হচ্ছে। অনুমান করা হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে ৯৭ শতাংশ জনসংখ্যার মাত্র চার শতাংশের কাছে ভাষার উত্তরাধিকার থাকবে। যে ৩৬৯টি ভাষা মানুষের চিন্তা, মনন ও প্রকাশের চূড়ান্ত পরিণতির সাক্ষী তারাও যে খুব নিরাপদে আছে তা নয়। ভাষার মৃত্যু নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সচেতনতা এশিয়া মহাদেশের থেকে অনেক বেশি।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এখন প্রায় ৭০০০ ভাষায় কথা বলা হয়। কিন্তু ভাষাবিদরা আশংকা করছেন আগামী কয়েক দশকে এই সংখ্যাটি দ্রুত হ্রাস পাবে। ১৯৯২ সালে প্রখ্যাত ভাষাবিদ ওনার বলেছিলেন, '২১০০ সালের মধ্যে জগতের ৯০ শতাংশ ভাষার অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হবে। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ক্লঁদে হ্যাজেজ বলেছেন, 'বেশিরভাগ মানুষই আদৌ ভাষার মৃত্যু সম্পর্কিত বিষয়ে আগ্রহী নন।' তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছেন, ভাষার মৃত্যুর সঙ্গে আর্থিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিশ্বায়নের সম্পর্কের বিষয়টিও আংশিকভাবে সত্য। এর পাশাপাশি লিপির অভাব, ভাষার মিশ্রণ এসবও একটি ভাষাকে লুপ্ত করে দিতে পারে। অন্যভাষার প্রতি আকর্ষণও ভাষা অবলুপ্তির কারণ হয়ে ওঠে। ভাষাতাত্ত্বিক হ্যারিসন জানাচ্ছেন যে, যেখানে আমেরকায় কোনও কোনও ভাষায় একজন বা দুজন জীবিত আছেন সেখানে ভারতের সব থেকে বিপিন্ন ভাষা মুন্ডাতে এখনও কথা বলেন দু-হাজারের বেশি মানুষ। সুতরাং একথা স্পষ্ট হার্দিক ইচ্ছে না থাকলে ভাষা পরিবারকে বাঁচানো যায়। যে গোষ্ঠী নিজের ভাষাটিকে সংরক্ষিত বা পুনরুজ্জীবিত করতে চায়, তারা অনেক কিছুই করতে পারে। যেমন বলা যায় আধুনিক হিব্রুর কথা। এই ভাষাটি যেটি তার প্রাচীন লেখ্যরূপে পড়া হতো সেটিকে অনেক অনেক শতাব্দীর পর মাতৃভাষারূপে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষার তীব্র প্রভাব থাকা সত্ত্বেও আয়ারল্যান্ডের মাতৃভাষা আইরিশ-এর প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সমর্থন রয়েছে। নিউজিল্যান্ডে মাওরি গোষ্ঠীগুলি কিছু কিছু শিশু শিক্ষানিকেতন স্থাপন করেছে যেখানে সব কিছু মাওরি ভাষার মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়। আর আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে বাংলার বদলে ইংরেজি, হিন্দি পড়ানো হয় প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ রূপে। এ এক আশংকাজনক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বাংলাভাষার পক্ষে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুল মুড়ি-মুড়কির মতো গজিয়েছে। আবার অন্য রাজ্যে যেখানে বাংলা স্কুল ছিল তারা তা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এ রাজ্যে অন্য ভাষা পড়ানো হবে বাংলা বাদ দিয়ে সেই ভাবনাটিও সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক।

মার্কিন সংস্থা এথনোলগ-এর তথ্য অনুসারে এই মুহূর্তে ৪৭৩টি ভাষা চরম বিপন্ন ভাষার তালিকাভুক্ত। এই সংস্থার তথ্য থেকে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ২ জন লিপান অ্যাপচে ভাষী মানুষ, ৪ জন টোটোরো ভাষী মানুষ কলম্বিয়ায় এবং ক্যামেরনে ১ জন বিদ্যাভাষী মানুষ জীবিত আছেন। ভারতে অবশ্য কোনও ভাষাতেই এমন শোচনীয় অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয়নি। বিপন্ন মুন্ডা ভাষাতে কমপক্ষে একহাজার জন বক্তা খুঁজে পাওয়া যাবে। কুরমালি ভাষা, হো ভাষাতে এখনও অসংখ্য মানুষ কথা বলেন। সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে এ-সব ভাষা হয়তো বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। শুধু ভাষাই রক্ষা পাবে না- ভাষার সঙ্গে তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবই রক্ষিত হবে। ভাষার মৃত্যু মানে তো ঐতিহ্যের মৃত্যু। একটি জাতির সম্পূর্ণ সংস্কৃতির মৃত্যু। যা অন্য জীবিত জাতির পক্ষেও ক্ষতিকর। বলা ভালো এটা অনেকটা অঙ্গহানির মতোই ভয়ংকর এক বিপদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি তাঁদের নিজেদের ভাষার অস্তিত্বের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছে। নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতির গর্ব এই মননে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ না করলে ভাষার মৃত্যুকে প্রতিহত করা যাবে না। 'এথনলোগ'-এর সম্পাদক পল লেইস মনে করেন, 'মানুষ যদি নিজেদের ভাষাকে গুরুত্বহীন বলে মনে করে। তবে তারা তাদের আত্মপরিচয়কেও অচিরেই গুরুত্বহীন মনে করেন। এতে শুধু ঐতিহ্যের মূল বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবে না ভাষাও ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগোবে।'

শুধুমাত্র ২১ ফেব্রুয়ারি বা ১৯ মে ভাষা দিবস পালন করলেই ভাষা অস্তিত্বের ক্ষেত্রে যত্ন নেওয়া হল, এমন মনে করার তেমন কোনও কারণ নেই। প্রতিটি মুহূর্তে জনগনকে সচেতন থেকে ভাষাকে বাঁচাবার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তে লড়াই জারি রাখতে হবে। নতুবা ভাষার অস্তিত্ব অর্থাৎ সেই ভাষার পুরো সংস্কৃতিকে ধরে রাখা যাবে না। হিব্রু, ব্রাহ্মী, মিশরীয় চিত্রলিপি, এট্রুসকান, লাতিন, সুমেরীয়, পালি ভাষাগত উৎকর্ষে পৌঁছেও আজ বিপন্ন মাতৃভাষার সারণিতে। মিশরীয় ভাষার মধ্যে আজ ৫০ শতাংশেরও বেশি আরবী ভাষা। মিশরীয়রা এভাবে তাদের সংস্কৃতি হারিয়ে আজ বেদনা-কাতর। সেই বেদন-কাতর দিন যেন না আসে। 'ভাষা আমার গর্ব, ভাষা আমার প্রাণ'- এই মন্ত্রে নিজেকে উজ্জীবিত না করতে পারলে অচিরেই হারাব নিজেকে।

কথায় কথায়

প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে সাহিত্যের ধারা, গল্প থেকে অণুগল্প, কবিতা থেকে অণুকবিতা, উপন্যাসও দাঁড়িয়েছে বড় গল্পের শব্দসীমায়। এই প্রসঙ্গে কী মনে করছেন কবি-সাহিত্যিকরা?

নীহারুল ইসলাম, সাহিত্যিক

বাংলা সাহিত্যে গল্প থেকে অণুগল্প বা কবিতা থেকে অণুকবিতা লেখার প্রবণতা ইদানিং বেড়েছে বলে মনে করি। তবে এই ধরনের লেখার চল দু-হাজার সালের পর থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। বড় উপন্যাস পড়তে পাঠক ভালোবাসে। তবে বাংলা সাহিত্যে সেই ধরনের বড় উপন্যাস লেখা হচ্ছে না তার অন্যতম একটি কারণ হিসাবে আমার ব্যক্তিগত মত, লেখার পিছনে যে শ্রম দেওয়া প্রয়োজন সেটি হয়তো আমরাই দিতে পারছি না। আবার পাশাপাশি আরেকটি কারণ হচ্ছে বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলি লেখার ওপর একটি বিধিনিষেধ দিয়ে থাকে। যেমন, কী নিয়ে উপন্যাস লেখা হবে সেই নিয়ে অনেকক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের স্বাধীনতা দিলেও একটি নির্দিষ্ট শব্দ সেখানে বেঁধে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা দেওয়ারও একটি বিষয় থাকে। তাই এক্ষেত্রে তাঁদেরও কিছু করার থাকে না, কারণ অনেক লেখককে দিয়ে লেখাতে হয়। আরও একটি বিষয় হচ্ছে, যে লেখক লিখছেন তাঁর সেই বিষয়ের ওপর কীরকম প্রস্তুতি রয়েছে, তিনি সেই বিষয়টিকে কতখানি আঁকড়ে ধরতে চাইছেন বা কতখানি আঁকড়ে ধরতে পেরেছেন সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা জমা দেওয়ার বিষয় যখন থাকে, তার মধ্যে লেখা সম্পূর্ণ করা, বিশ্লেষণ করা সেই বিষয়গুলিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত বাধ্যবাধকতার মধ্যে হয়তো সেই ধরনের লেখা হয়ে উঠছে না। তবে এর মধ্যেও একটা কথা বলব, লেখকরা নিজের তাগিদেই লিখে থাকেন। কোনও কোনও লেখক হয়তো বাণিজ্যিক পত্রিকার দিকে মুখ চেয়ে থাকেন। সেটা তাঁদের ওপর নির্ভর করে।

অংশুমান কর, কবি ও অধ্যাপক

বাংলা সাহিত্যে অণুকবিতা, অণুগল্প লেখার প্রবণতা তৈরি হওয়াকে সাম্প্রতিকতম ঘটনা বলে মনে করি না। তবে এই ধরনের লেখার চল ইদানিং বেড়েছে। তবে শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, জাপানি ভাষাতেও একলাইনের কবিতা লেখা হয়েছে। বর্তমানে উপন্যাসের জায়গায় নভেল এসেছে। এই পরিবর্তনকে আমরা সাম্প্রতিকতম ঘটনা বলতে পারি।

ইদানিং ফেসবুকে কবিতার লেখার একটি চল হয়েছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও দেখেছি ফেসবুকে প্রবন্ধ লিখে পোস্ট করলে সেটির থেকে ছোট কবিতা পড়ার পাঠকের সংখ্যা অনেক বেশি। ফেসবুকে কবিতা লেখাও একটি নতুন প্রবণতা। এই মাধ্যমে লেখার বিরুদ্ধে আমি নই। কারণ ফেসবুক থেকে মানুষের সঙ্গে সরাসরি একটা যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে। তবে কবিতার পড়ার পাঠকের সংখ্যা খুব কম। ফেসবুকেও কবিতার পড়ার পাঠকের সংখ্যা খুব বেশি।

বিশ্বায়নের যুগে এখন মানুষের জীবন খুব ফার্স্ট। আগে একটা সময় যেভাবে এপিক লেখা হতো এখন সেভাবে আর হয় না। এই ধরনের নানা পরিবর্তন আগামিদিনেও ঘটবে সেটাই স্বাভাবিক। অনেক কিছুই মেনে নিতে হবে।

আসলে সামগ্রিকভাবে দীর্ঘকবিতা লেখার যে চল সেটা কমে এসেছে। সকলের কথা বলতে পারব না, তবে এই ধরনের প্রবণতা আমার মধ্যে একটি বেদনাবোধ তৈরি করেছে।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ

বাংলা ছোটগল্পে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন: সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম

কার্তিককুমার মণ্ডল *গবেষক,*
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া

(গত সপ্তাহের পর)

৮ এপ্রিল ২০০৭, 'বর্তমান' পত্রিকায় 'চাকরি' গল্পে দীপঙ্কর দাস শৈল্পিক কুশলতায় সাধারণ কৃষকের জীবনে শিল্পায়নের ভবিষ্যৎ পরিণতির ছবি বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পে কৃষকসভার সদস্য শেখেরখালের দুলাল সর্দারের ছেলে বিশু সর্দারের জীবনের করুণ অবস্থার ছবি তুলে ধরেছেন গল্পকার। সিপিআইএম নেতারা বিশুর মতো চাষিদের ডেকে বুঝিয়েছে, 'এই জমিতে বিশিষ্ট শিল্পপতি মোটর গাড়ির কারখানা গড়বে। জমির বিনিময়ে সরকার চাষিভাইদের ভালো দর দেবে। চাষিভাইরা সেই টাকাকে পুঁজি করে যেমন ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারবে, তেমনি তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য তৈরি হবে অনেক কাজের সুযোগ। চাকরি পাবে তারা'। একথা শোনার পর বিশু তার পৈতৃক সাহেববাগানের জমি বিক্রির কথা তার স্ত্রীকে বললে তার স্ত্রীর মনে প্রশ্ন জাগে, তাই সে বলে, 'ওই জমি বেচবে তুমি? ওই জমিই তো আমাদের পেটের ভাত জোগায়। ওই জমি বেঁচে দিলে আমরা খাব কী?' কিন্তু অসহায় বিশু কাজলের কথার মর্ম বুঝলেও জমি দিতে সে বাধ্যই হয় শেষ পর্যন্ত। কারণ সে জানে, পার্টির নির্দেশ আছে। কারখানার জন্য জমি দিতে হবে। 'নিজে থেকে দিলি পড়ে বেশি দর দিবে। না দিলি পরে ভিটে মাটি থিকে খালি হাতে উচ্ছেদ হতি হবে'। পরবর্তী সময়ে দেখি গল্পে বিশুর কথা বাস্তবে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। সিঙ্গুরের চারশো একর জমি অনিচ্ছুক চাষিদের কাছ থেকে সরকার জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে প্রাচীর দিয়েছে, তারা অনেকেই কানাকড়িও পায়নি। এ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন চাষি বিশু জমি হারানোর ফলে রুজি রোজগারহীন হয়ে পড়েছে। ফলে তার পরিবার তছনছ হয়ে গেছে। সর্বস্ব খুইয়ে কাঞ্চনপুরের বস্তিতে আশ্রয় নেয় বিশু। ছেলে অনাদি জড়িয়ে পড়ে অন্ধকার জগতের সঙ্গে। তার মেয়ে আকন্দ সংসার চালানোর জন্য এখন গণিকাবৃত্তির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। পার্টির নেতারা আশ্বাস দিয়েছিল কারখানা হলে সবার চাকরি হবে। চাকরি অবশ্য হয়েছে বিশুর মেয়ে আকন্দর- আর তা হল গণিকার চাকরি। তাই 'উচ্ছেদের গল্প' সংকলনে অভিজিৎ সেনগুপ্ত এই গল্প সম্পর্কে বলেছেন, মহেশ গল্পের গফুর শহরে চটকলের কাজে যেতে ভরসা পাচ্ছিল না কেননা সেখানে মেয়েদের ইজ্জত থাকে না। সেই অবস্থা পালটাবার কোনও বিশেষ কিছু কারণ ঘটেনি এই দীর্ঘ সময়েও। প্রায় একই আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে দেশ। বরং পুঁজি আরও বেশি সচল ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে বিশ্বায়নের মাধ্যমে। কাজেই জমি হারানো আকন্দকে গণিকাবৃত্তিই করতে হবে শেষ অবধি তাতে আর আশ্চর্য কী? এই বিষম উন্নয়ন তো এদিকে ঠেলে দিতেই পারে তাদের।' সত্যিই বিষম উন্নয়নের শিকার আকন্দ-র মতো অনেক মেয়েই।

সিঙ্গুরে জমি দিতে অনিচ্ছুক চাষিদের জোর করেও ইচ্ছুক করা যায়নি। বারবার হাজতবাস ও পুলিশের জুলুমকেও ভয় পায়নি তারা। বেশিরভাগ চাষিকেই জোর করেও জমি বিক্রি করানো যায়নি। সৌমেন্দ্র গোস্বামীর 'এবং তৃতীয়বার' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯) গল্পে 'যুথী' হল এরকমই একজন চাষির বউ, যে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তার সঙ্গে প্রতিবাদে সামিল হয় গ্রামের অসংখ্য যুথী। তাদের সম্মিলিত প্রতিরোধে পুলিশ পালাতে পথ পায় না, সেকথাই গল্পে উঠে এসেছে এভাবে, 'বেচারা পুলিশ। ওরা একটুও যুথী কোলের বাড়ির উঠোনে শান্তিতে দাঁড়াতে পারেনি। ওদের দেখেই খোঁটায় বাঁধা গরুটা খোঁটা ছিঁড়ে তেড়ে গেছে। গরুটাকে কোনওরকমে সামলে নিয়ে তন্ত্রসাধক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর আর মার্কসবাদী স্বঘোষিত দালালের অনুচর দেখতে পেয়েছেন উঠোনে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা সবাই দশ-মহাবিদ্যার এক-একটা রূপ। কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা। তাদের মধ্যে একজন যুথী কোলে। বাকিরা তার পাড়া-পড়শির বাড়ির মেয়ে-বউ, তারাও বেরিয়ে এসেছে যুথী কোলের সঙ্গে, একসঙ্গে। তাদের কারোর হাতে ধারালো বঁটি, কারোর হাতে হেঁসো, দা, কাটারি কেউ কেউ খালি হাতেও আছে'। এভাবেই গল্পকার গল্পে সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের ভিত্তিভূমিটি যেমন স্পষ্ট করেছেন তেমনই জমি অধিগ্রহণ পরবর্তী সেখানের মানুষের দুরবস্থার ছবিও ভাষারূপ দিয়েছেন গল্পকার। তাই পৌষ-পার্বণের দিন যখন টাকার অভাবে গুড় কেনারও সামর্থ্য ছিল না তখন বাধ্য হয়ে সেই যুথী কোলেই যায় কারখানার লোহা চুরি করতে। একথা ভেবে যুথীর কষ্ট হয়। তাই দেখি 'জমি চলে যাওয়ার পর রোজ বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, তাই ছেলেটাকে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে ঢালাই কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে কাজ শেখানোর জন্য'। যদিও সে কাজ টাকার বিনিময়ে নয় খাদ্যের বিনিময়ে। এমন দুর্দিনের যুথী কোলে নুইয়ে পড়েনি, তাই 'যুথী কোলে আবার নতুন করে শান দিয়ে হেঁসোটা সবসময় হাতের কাছে রেখে দিয়েছে। ঠিক করে রেখেছে-আর ভয়ও পাবে না। কারখানার পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাসও ফেলবে না। ও-পাঁচিল খুব শিগগিরই ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেবে ওরা।... ছেলেকে কারখানা থেকে ছাড়িয়ে এনে স্কুলে আবার পাঠাবে।' ভবিষ্যৎ কল্পনায় ভরে ওঠে তার সাংগ্রামী মন। তাই তার জন্য যদি তৃতীয় বার হাজতবাস হয় তাতেও ভয় নেই, নেই আপত্তিও।

সরাসরি সিঙ্গুর প্রসঙ্গ এসেছে মানব মল্লিকের 'নবজন্ম' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯) গল্পে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনির্বাণ শিক্ষিত বেকার যুবকের প্রতিনিধি। সরকার জোর করে অনিচ্ছুক চাষিদের জমি অধিগ্রহণ করে প্রাচীর দিলে টাটা কোম্পানির কারখানার কাজ শুরু হয়। শিক্ষিত বেকার অনির্বাণ বাবার জমিদানের পরিবর্তে কারখানার কাজে যোগ দিলেও স্থগিতাদেশের ফলে কারখানার কাজ বন্ধ হয়। আবার কর্মহীন হয়ে পড়ে অনির্বাণ। আর তখনই তার শিক্ষিত যুক্তিবাদী মন সমস্যার গভীরে পৌঁছেছে। প্রশ্ন জেগেছে, 'এই স্থগিতাদেশ কার জন্য? সত্যিই কি সেদিন জমি অধিগ্রহণের পথ-পদ্ধতিতে ভুল ছিল না? একশো চুয়াল্লিশ ধারা বহাল রেখে, মেরে-ধরে, মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে, সান্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে হাতে হাতে চেক ধরিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কি জানার দরকার ছিল না- প্রকৃতিগতভাবেই সব মানুষ এক নয়।... ভুলটা তো স্বীকার করলোই না, উপরন্তু 'আমরা-ওরা'র বিভেদ টানলো। হুঙ্কার দিলো, ওরা ত্রিশ আমরা দু'শো পয়ত্রিশ !' টাটার কারখানায় চাকরি করলেও সরকারের ঔদ্ধত্যকে সমর্থন করতে পারেনি অনির্বাণ। তাই আর পাঁচজন সচেতন মানুষের মতোই তার সংশয়ী মন প্রশ্ন তুলেছে, 'সরকার কেন টাটাকে এত ভর্তুকি দিচ্ছে?' অনির্বাণ তাই সোজা হিসাব দেখেছে, 'ষাট বছর পর, টাটা ছাড়া অন্য কোম্পানিগুলো ইউনিট প্রতি আঠারোশো আশি টাকা গুণবে, আর টাটা গুণবে ছ'টাকা। অর্থাৎ নব্বই বছর ধ'রে, টাটাদের জন্য বছরে গড়ে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা করে সরকার ভর্তুকি দেবে বিদ্যুৎ খাতে। কেন? কোন অধিকারে পরবর্তী প্রজন্মের মাথায় এতবড় বোঝা চাপাবে সরকার?' এসব বিষয় অনির্বাণকে ভাবিয়েছে এবং নিজেকে স্বার্থপর মনে হয়েছে এসব জেনেও টাটা কোম্পানিতে কাজ করার জন্য। তাই প্রায়শ্চিত্তের পথ খুঁজতে রাস্তায় নেমেছে সেইসব মানুষগুলোর সঙ্গে, যারা শ্লোগান দিচ্ছে, 'মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে আমরা শিল্প চাই না। ধাপ্পাবাজি আর অস্বচ্ছতার মধ্যে শিল্প চাই না। ভর্তুকি দিয়ে তেলা মাথায় তেল দিয়ে শিল্প চাই না।' গল্পটিতে গল্পকারের একপেশে মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠলেও জমি অধিগ্রহণ প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাব ও টাটাদের ভর্তুকি প্রসঙ্গটিকে যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে গল্পটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না।

আবার 'নাম' গল্পে সুরঞ্জন প্রামাণিক লোকখেলার আঙ্গিকে জমি অধিগ্রহণের কথাকে তুলে ধরেছেন। কৃষকের জমি হারানোর যন্ত্রণাকে 'ইলাটিন বিলাটিন সই লো' নামের লোকছড়ার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। গল্পে নাম না করে উঠে এসেছে তাপসী মালিকের প্রসঙ্গ, 'একদিন ভোরবেলা কেউ একজন দেখলো ঝলসানো এক মেয়ে পড়ে আছে মাঠের মধ্যে।'

অন্যদিকে, অরু সান্যালের 'মাটি' ('উবুদশ', নভেম্বর ২০০৯) গল্পে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের মিটিং মিছিলের কথা ও আন্দোলনকারী মানুষের জমির প্রতি ভালোবাসার কথা উঠে এসেছে- 'গুলি খেয়ে গজেন মাটিতে পড়েছিল তাকে তুলতে গিয়ে সুখী দেখেছিল-তার মুঠোয় খামচে ধরা মাটি। মরে গিয়েও গজেন মাটি ছাড়েনি। সুখীর শরীরে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে গজেনের রক্তাক্ত শরীর।' এমন সময় দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ হলে বৃদ্ধ শ্বশুরের পরামর্শে জানালা টপকে পালায়। শাসকের অত্যাচারে গজেনের বাবার মনে পড়ে যায় বাহাত্তরের রাতের কথা। সেদিনও পুলিশ আর কংগ্রেসের অত্যাচারে লণ্ড-ভণ্ড করে দেয় সব। কিন্তু আজ সে দেখে অন্যরূপ, 'পিলপিল করে ছুটে আসছে সারা গ্রাম। আর তাদের সামনে হেঁসো হাতে মাতঙ্গিনী হাজরার মতো সুখী।' এতো কোলাহলে বুড়ো যেন দেখতে পায় ছেলে গজেনকে। তাই 'লাঠিটা শক্ত হাতে ধরে আবার সে উঠে দাঁড়ায়'। এ গল্প জমি হারানোর আশংকায় মানুষের উঠে দাঁড়ানোর গল্প।

সার্বিকভাবে গল্পগুলির আলোচনার শেষে আমরা দেখতে পাই গল্পগুলিতে আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে নানাভাবে। গল্পগুলিতে উঠে এসেছে জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে সরকারের মিথ্যাচারের কথা। পুলিশের সহচর্যে ক্যাডার বাহিনীর সন্ত্রাস। আর এই সন্ত্রাস প্রতিরোধে কৃষকের মরণপণ লড়াই। বারবার এসেছে জমি হারানোর অবসাদে কৃষকের আত্মহত্যার কথা, তাপসী মালিক তথা অন্যান্য শহিদদের কথাও। মিডিয়া রাজনীতি, ক্যামেরার সামনে নেতাদের মিথ্যাভাষণ। বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রামী ভূমিকার সঙ্গে দোলাচলতাও গল্পের বিষয় হয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে উল্লিখিত বিষয় সচেতনভাবে কোথাও না কোথাও এসেছে। তবে একটা গল্পে সব বিষয় না থাকলেও সমগ্র গল্পগুলি একত্রিত করলে গল্পের মধ্যেই আমরা পেতে পাড়ি সেই সময়ের ইতিহাস-রাজনীতি-অর্থনীতিকে। যেমনভাবে তেভাগা আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলনের ইতিহাস উঠে এসেছে সেই সময়ের সাহিত্যে। তেমনই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলের ইতিহাস উঠে এসেছে সাহিত্যে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ইতিহাসের রসদ মিলবে এই গল্পগুলিতে একথা বলাই বাহুল্য। *(শেষ)*

যুগশঙ্খ
SUPPLI
রবিবার, ২০ মে ২০১৮

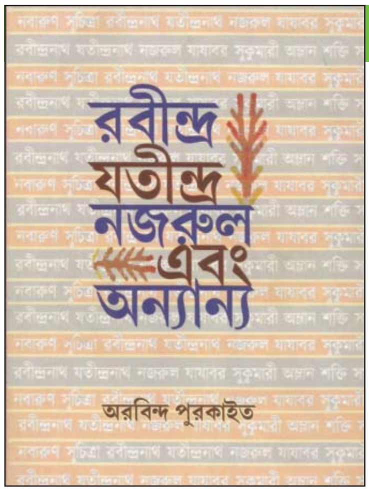

সংগ্রহে রাখার মতো একটি অনবদ্য বই

প্রতিমা ঘোষ

বই নানাভাবে নানা কারণে লেখা হয়ে থাকে। তাই একেকটি বই-এর তাৎপর্যও একেক রকম। রচনা এবং প্রবন্ধের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য তেমন না থাকলেও কেন্দ্রগত বা বিষয়গতভাবে কিছু কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। লেখক অরবিন্দ পুরকাইত-এর 'রবীন্দ্র যতীন্দ্র নজরুল এবং অন্যান্য' বইটিও সেই দিক নির্দেশ করে দেয়। একটি বই উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে এক বা একাধিক কারণে। এই বইটিরঅ তেমন কিছু বিষয় আছে।

বইটির প্রথমেই রয়েছে রবীন্দ্রবন্দনা। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে দেখতেন সেই প্রেক্ষিত থেকে। বিভূতিভূষণ, রমেশচন্দ্র দত্ত থেকে শুরু করে বিষ্ণু দে। সুনীল এবং আজকের জয় গোস্বামী কীভাবে রবীন্দ্রনাথকে এঁকেছেন তার একটা ফিরিস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। এরপর লেখক যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য জীবন আলোচনা করেছেন। যতীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রবিরোধী আসনে বসাতে চেয়েছেন কারও কারও বক্তব্যকে মননে লালন করে। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকেই তাঁর প্রথম উত্তর সাধকরূপে মনে করতেন। যতীন্দ্রনাথ বয়সে বড় হলেও নজরুলের কাব্য 'যুগের বানী' (১৯২২) প্রকাশিত হয় যতীন্দ্রনাথ-এর মরীচিকার আগে। ১৯২২-২৩ সালের মধ্যে নজরুল, রবীন্দ্র মানসিকতাকে গ্রহণ ও নস্যাৎ করেই যেন নতুন পথ দেখালেন। এলিট সম্প্রদায়ের কবি বুদ্ধদেব বসুও তার মত বর্জন করে এই মত মেনে নেন।

লেখকের অনেক কোটেশান-এর উৎসমুখ না থাকায় সাধারণ পাঠকের দোলাচল সৃষ্টি হয়। তাই লেখাটি হয়তো গবেষণাধর্মী হতে পারত, কিন্তু সেরকম হয়নি। ক্রমবিন্যাস ও পর্যায় অনুযায়ী কোটেশনগুলোর সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে সাজালে এবং আরও একটু যত্ন নিলে কাজটি অনেক সুন্দর হতে পারত। বইটি যেন প্রথম শর্ত পালন করেই ক্লান্ত অনুভব করে।

'কবিকে খোঁজো না জীবনচরিতে'— রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে কেন্দ্র করে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তাও তর্ককে উস্কে দেয়। কবির একটি অন্তঃপ্রদেশ থাকতে পারে না- এ যেমন বলা যায় না তেমনি তার বিপরীত দিকটাও ভাবতে হবে। যেমন যা বিশ্বাস করি তা লিখি না আর যা লিখি তা বিশ্বাস করি না। সকালবেলার ভাষণে নারীবাদী সন্ধ্যেবেলায় তাকে পণ্যভাবী। এটি অন্তঃপ্রদেশের কৌশল যেন না হয়।

এইসব কিছু বাক-বিতণ্ডা বাদ দিলে বইটি বেশ তথ্য সমৃদ্ধ। 'অম্লান দত্ত', 'হারবার্ট' এবং 'সুচিত্রার নারী, 'নারী ভাবনা' রচনাগুলি যথেষ্ট সমৃদ্ধ। 'সুকুমারী এবং নারীও শুদ্র প্রসঙ্গ' লেখাটিতে বাদল ঘোষ-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন লেখক। কিন্তু সেই লেখাটির গুরুত্ব কমে যায় কেননা তা প্রকাশিত হয় সুকুমারী দেবীর মৃত্যুর পর। তাছাড়া নিয়োজিত মহিলা তাঁকে প্রুফ দেখিয়েছেন কিনা সে বিষয়েও থেকে যায় সংশয়। সুকুমারীদেবীকে একটু ভাবায় বৈকি? এত সব স্বত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যায় অরবিন্দ পুরকাইত-এর বইটি হাতের কাছে থাকা জরুরি। শুভ জোয়ারদারের প্রচ্ছদটিও মানানসই।

- রবীন্দ্র যতীন্দ্র নজরুল এবং অন্যান্য | অরবিন্দ পুরকাইত | সুচেতনা, গোচারণ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা | ১৫০ টাকা।

গ্রন্থ সমালোচনার জন্য আপনার প্রকাশিত
২ কপি বই পাঠান এই ঠিকানায়:
যুগশঙ্খ সাপ্লি, ৭ এসপ্ল্যানেড ইস্ট,
কলকাতা ৭০০০৬৯
ই-মেল: jugasankha.suppli@gmail.com

এই সপ্তাহে আপনার ভাগ্য

২০-২৬ মে, ২০১৮

মেষ: ২০-২১ তারিখের মধ্যে আর্থিক মামলা নিয়ে আপনি গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দেবেন। পরিবারে কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যোগ দেখা যায়। নতুন কোনও কাজের সূচনা হওয়ার জন্য এটা শুভ সময়। বকেয়া টাকার অনেকটা হাতে আসবে। ২৪-২৫ তারিখের মধ্যে প্রচুর প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে আপনি কাজে যোগ দেবেন। এসময়ে কোনও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলাপ ভবিষ্যতের জন্য লাভদায়ক হবে। অন্তভাগে আপনি কোনও সৃজনশীল কাজে যুক্ত থাকবেন। সরকারি কাজেও সফলতার যোগ দেখা যায়।

বৃষ: বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা ২০-২২ তারিখের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করবেন। হঠাৎ করে এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসময়ে আপনার কাছে আসবে, যা আপনি ভাবতেও পারেননি। ২৩ তারিখে প্রাপ্তিযোগ স্পষ্ট। ২৪-২৬ তারিখটা অর্থাৎ অন্তভাগ রাজনীতিবিদদের পক্ষে শুভ। নতুন নতুন জনসংযোগ গড়ে তুলুন। পরে কাজে লাগবে।

মিথুন: জাতক-জাতিকাদের জন্য ২০ ও ২১ তারিখও সর্বলাভকারী দিন। নানাদিক থেকে আপনি লাভবান হবেন। ব্যবসাতে উন্নতির স্পষ্ট যোগ প্রতীয়মান হয়। ২২-২৩ তারিখ চন্দ্র আপনার রাশির দ্বাদশ স্থানে অবস্থান করার জন্য সময়টা অশুভ। মধ্যভাগে বেড়ে যাবে প্রচণ্ড খরচ। সঙ্গে বাড়বে মানসিক চাপও। ২৪ তারিখ থেকে ফিরে পাবেন যাবতীয় মানসিক শান্তি। দিনদুটি মিশ্র ফলদায়ক। ২৬ তারিখে উপার্জনের ভালো যোগ রয়েছে।

কর্কট: কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা সপ্তাহের আদ্যভাগে ধার দেওয়া টাকার অনেকটাই ফেরত পেয়ে যাবেন। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজের প্রশংসা করবেন। ২১-২৩ মে-র মধ্যে নিজের কথাবার্তা আর রাগের উপর সংযম রাখতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। মধ্যভাগে আর্থিক সংকটের শংকা দেখা যায়। ২৫-২৬ তারিখে যে কোনও প্রতিযোগিতায় আপনি সফল হবেন। জীবনের প্রতি একটু সিরিয়াস দৃষ্টিভঙ্গি নিন। সন্তানের গতিবিধির উপর সপ্তাহের অন্তভাগে নজর রাখুন।

সিংহ: ২০ তারিখে আপনার সহযোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা আপনার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। তা সত্ত্বেও আদ্যভাগে কোনও সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। নিজের কথা ও ক্রোধের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখুন। নতুন কোনও ডিল এসময়ে সই করবেন না। ২৪ তারিখে কোনও অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে ধনলাভের যোগ দেখা যায়। উৎসাহ, পরিশ্রমের দ্বারা আপনি সব কাজই সম্পন্ন করবেন। অন্তভাগে নানারকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার জন্য আপনার মন অশান্ত হয়ে উঠবে। এসময়ে কাউকে ভুলেও টাকা ধার দেবেন না।

কন্যা: কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের সপ্তাহের আদ্যভাগে অর্থলাভের স্পষ্ট যোগ প্রতীয়মান হয়। আগের থেকে অনেক বেশি যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে পারবেন। তবে সপ্তাহের আদ্যভাগের শেষদিকে কোনও ষড়যন্ত্রের শিকার আপনি হতে পারেন। শরীর খারাপ হওয়ার আশংকা দেখা যায়। দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী কোনও বস্তু এসময়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে। ২৪-২৫ তারিখ দিনদুটি স্বাভাবিক। দম্পতিদের মধ্যে বজায় থাকবে যাবতীয় সুসম্পর্ক। আপনিও নিজের দৈনন্দিন দিনচর্যায় গুরুত্বপূর্ণ রদবদল নিয়ে আসবেন। ২৬ তারিখ দিনটি মিশ্র ফলদায়ক।

তুলা: কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের ফল আপনি সপ্তাহের আদ্যভাগেই পাবেন। গোড়ার দিকের বেশ খানিকটা সময় পারিবারিক কাজে ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে। ২২-২৩ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ এনার্জি নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি এসে আর্থিক সংকট অনেকটাই কেটে যাবে। ২৪-২৫ তারিখ দিনদুটি আপনাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট নানান সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন। এসময়ে আচমকা কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা মানসিক প্রফুল্লতা নিয়ে আসবে। ২৬ তারিখে সামান্য অর্থকষ্ট হলেও আপনি তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

বৃশ্চিক: এতদিনকার যাবতীয় বিনিয়োগে লাভ পাবেন সপ্তাহের আদ্যভাগ থেকেই। ২২-২৩ তারিখে বৃদ্ধি পাবে যাবতীয় সামাজিক মান-সম্মান। ২৪-২৫ তারিখে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে হৃদয়ের বদলে মস্তিষ্ক দিয়ে বিচার করুন। তাহলে আপনার সব কাজেই মোটামুটি সফলতা প্রতীয়মান হয়। আবেগের বদলে যুক্তি দিয়ে সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতকে বিচার করুন। মধ্যভাগে এসে বৃশ্চিক রাশির লোকজনের পদোন্নতির সুযোগ আছে। তবে ২৬ তারিখ দিনটি আপনার জন্য প্রতিকূল।

ধনু: ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের সপ্তাহের শুরুতে শরীরখারাপ ভোগাবে। অনিদ্রা রোগের প্রকোপ বাড়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। ২২-২৩ মে-র মধ্যে নানা কাজে আপনি যারপনারই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। মধ্যভাগে পারিবারিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করে অনেকটা সময় ব্যয়িত হবে। এই সময়ে ধর্ম-কর্ম এবং আধ্যাত্মিকতায় অনেকটা সময় ব্যয় হবে। তবে অন্তভাগের সময়টা তুলনামূলক শুভ। ২৬ তারিখ থেকে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার আপনার সামনে খুলে যাবে।

মকর: সপ্তাহের আদ্যভাগের সময়টা স্বাভাবিকভাবেই কাটবে। নানারকম দৈনন্দিন কাজে এইসময়ে আপনি ব্যস্ত থাকবেন। তবে এইসময়টা দাম্পত্যজীবনের পক্ষে শুভ নয়। দম্পতিদের মধ্যে বিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝির আশংকা দেখা যায়। আর্থিক সমস্যা থাকবে, বেড়ে চলবে ঋণের মাত্রাও। ২৪ ও ২৫ তারিখে উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসারদের সহায়তা আপনি পাবেন। এর ফলে আটকে থাকা কাজের অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে। এইসময়ে এনার্জি নিয়ে নতুন কর্মপরিকল্পনায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন। ২৬ তারিখে যাবতীয় দাম্পত্য ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।

কুম্ভ: ২০-২৩ তারিখের মধ্যে নানান সাধু-সন্তদের আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবেন। এইসময়টা আপনার জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য একেবারেই আদর্শ। কাজের গণ্ডি অনেকটাই বিস্তৃত হবে। কেরিয়ারই এইসময়ে আপনার কাছে গুরুত্ব পাবে। তবে ২৪ ও ২৫ তারিখে চন্দ্রের অবস্থানহেতু আপনাকে নানান সমস্যায় পড়তে হবে। খাওয়া-দাওয়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টি না দিলে আপনার শরীর খারাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে। ২৬ তারিখে আপনার এতদিনকার কঠোর পরিশ্রমের ফল আপনি পাবেন।

মীন: ২৯ তারিখে নানান কারণে মানসিক চাপ বাড়লেও ২১ তারিখ থেকে পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠবে। ২২ ও ২৩ তারিখ দিনদুটিও শুভ। সরকারি কাজে সফলতা মিলবে। এতদিন ধরে চলে আসা কোর্টকেসের রায় আপনার পক্ষেই আসবে। মধ্যভাগে এসে সম্পত্তি-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা মিটে যাবে। আটকে থাকা প্রকল্পের কাজ ফের শুরু হওয়ার আশা দেখা যায়। ২৬ তারিখে কিন্তু সফলতা পেতে সংঘর্ষ করতে হবে।

দ্রোণাচার্য

খুব শীঘ্রই আবার শুরু হবে ছোটদের বৈঠক। ছোটরা নজর রেখো কিন্তু...

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: **বিপ্লব রায়** | সাপ্লি টিম: তন্ময় মণ্ডল, শর্মিলা চন্দ্র, বিপাশা চক্রবর্তী, সোমনাথ আদক, দোয়েল দত্ত
চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: ৭ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯ • ই-মেল: jugasankha.suppli@gmail.com • সাপ্লি সংক্রান্ত যোগাযোগ: ০৩৩ ৪০৬০৫৮৩৭